www.banglainternet.com
represents

Poribesher Sonkat Ghoniye Asche

(An environmental crisis is drawing near)

Abdullah Al-Muti

পারস্যের শকট খানায় আসছে

আবদুল্লাহ আল-মুতী

পীরতলার সংকট

আবদুল্লাহ আল-মুতী

www.banglainternet.com

সূচিপত্র

ভূমিকা	*ix*
পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে	১
গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া সমাচার	১২
দুনিয়া জুড়ে 'এত্তা জঞ্জাল'...	২৩
জলাজমি যেন সোনার খনি	৩৫
নদীরা হ্রদেরা কেন মরে যায়	৪৩
বৈকালকে বাঁচাতে হবে	৫১
তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিষম বিপদ	৬০
হিরোশিমা-নাগাসাকির দগদগে ক্ষত	৭৪
জীবজগতের বৈচিত্র্য কমে আসছে	৮২
লবঙ্গ-এলাচের সুরভি ও প্রজাতির উৎস	৯৫
পরিবেশের সংকট ও শিক্ষা ব্যবস্থা	১১০
রবীন্দ্র ভাবনায় শিক্ষা ও পরিবেশ	১১৮

www.banglainternet.com

Goto List

ভূমিকা

পৃথিবীর ইতিহাসে ভয়াবহতম যুদ্ধ ঘটেছিল এই শতাব্দীর ত্রিশ আর চল্লিশের দশকে। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মাত্র ছ'বছরে নিহত হয়েছিল প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ, আহত হয়েছিল আরো বহু কোটি। এই যুদ্ধের প্রয়োজনেই আবিষ্কৃত হয়েছিল ইতিহাসের ভয়াবহতম মারণাস্ত্র পরমাণু-বোমা; আর সে বোমা ব্যবহৃত হয়েছিল প্রায় দু'লক্ষ মানুষের প্রাণ সংহারের জন্য। আমাদের দেশে এ যুদ্ধ সরাসরি আসে নি, তবু তার যেটুকু ছোঁয়া লেগেছিল তাতেই মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা; মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে প্রাণ দিতে হয়েছিল অন্তত ত্রিশ লক্ষ মানুষকে।

তারপর ষাটের দশকে দেখা গেল আরো একভাবে মানুষ ভয়াবহ ধ্বংসকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে। এ ধ্বংস যুদ্ধের মতো এমন তাৎক্ষণিক নয়, দীর্ঘ সময় ধরে ধীর গতিতে; কিন্তু মানুষের সভ্যতা ধ্বংস করার জন্য এর প্রভাব আরো গভীর, আরো সুদূরপ্রসারী। ১৯৫৯ সালে র‍্যাচেল কারসন-এর বই 'দ্য সাইলেন্ট স্প্রিঙ্গ' বা 'মৌন বসন্ত' বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের দেশে দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। মানুষ যে আজ 'উন্নয়ন'-এর নামে প্রায় অজান্তে পরিবেশের কী দারুণ ক্ষতি করে চলেছে সে কথা এর আগে এমন মর্মস্পর্শী করে আর কেউ তুলে ধরেন নি। বন-বনানী ধ্বংস করে, কৃষি ক্ষেতে প্রচুর সার আর কীটনাশক ছড়িয়ে, বিষাক্ত রাসায়নিক আবর্জনা যত্রতত্র ফেলে মানুষ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে, প্রাণিকুলকে ধ্বংস করছে।

এই সময়েই শোনা যেতে লাগল গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার কথা। কল-কারখানা থেকে বিষাক্ত ধোঁয়া আর কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস নিঃসরণের ফলে কিভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে উঠতে পারে তার কথা। প্রথম প্রথম অনেকে বিশ্বাস করতে চায় নি সে সব কথা। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলোর শিল্পমালিকদের কাছে এসব কথা তেমন প্রীতিপ্রদ মনে হয় নি। কেননা পৃথিবীর পরিবেশে এই মারাত্মক ক্ষতি সাধন করবার দায়-

www.banglainternet.com

Goto List

দায়িত্ব অনেকটাই এসে পড়ে তাদের ঘাড়ে। তাই অনেকে এসব আশঙ্কা অমূলক বলে প্রমাণ করবার চেষ্টাও করতে লাগলেন।

কিন্তু আজ আর সন্দেহের কোন কারণ নেই। পৃথিবীর পরিবেশের সংকট নিয়ে জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে বিশ্বের শীর্ষনেতারা ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোতে 'ধরিত্রী সম্মেলন' করেছেন । এই সম্মেলনে পৃথিবীর জলবায়ুর নাড়িনক্ষত্র টিপে দেখার জন্য একটি বিশাল আন্তঃসরকার বিজ্ঞানীদল গঠন করা হয়েছিল। তাঁরা অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে বলছেন, আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির স্পষ্ট লক্ষণ আজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মেরু অঞ্চলের হিমশৈল এর মধ্যে গলে যেতে আরম্ভ করেছে; গলছে উঁচু পর্বতের ওপরকার যুগ যুগ ধরে শিলীভূত হিমবাহ। তাপমাত্রা কী হারে বাড়ছে তার একটা হিসেবও এই বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন। গত দেড় শ' বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ এক ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি।

পরিবেশের অবনতির আরো বহু লক্ষণ আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে। চাষের জন্যও দেখা দিচ্ছে পানির অভাব। কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য নির্বিচারে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করার কারণে নষ্ট হচ্ছে জমির গুণাগুণ। মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে। বন-বনানী ধ্বংস হবার ফলে কমছে উদ্ভিদ আর বন্য প্রাণী। নিঃশেষ হয়ে আসছে সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ।

বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীর সব দেশের শীর্ষে সেখানে এসব খবর নিঃসন্দেহে পরম আতঙ্কের কারণ। মাথা পিছু জমির পরিমাণ এখানে অতি সামান্য; তার ওপর এই নিচু বদ্বীপ এলাকাকে গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে ফেঁপে ওঠা সাগর জল গ্রাস করবে সবার আগে।

পরিবেশের এই যে নিদারুণ সংকট এক ভয়ংকর দানবের মতো ক্রমেই এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে তারই নানা দিক নিয়ে এ বই। কী এ সংকটের চরিত্র? তার কিছু নমুনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এ বইতে। শুধু সংকটের চরিত্র নয়, তার নানামুখী সমাধানের কথাও পাওয়া যাবে এতে। আর হয়তো পাঠকদের কৌতূহলের উদ্রেক করবে এটা জেনে যে, আমাদের সংস্কৃতি অঙ্গনের এক মহারথী কিভাবে আজ থেকে এক শ' বছর আগেও প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনের কথা বলে গেছেন তাঁর কাব্যে, গানে এবং আরো অজস্র রচনায়।

এদেশের পাঠক-পাঠিকাদের পরিবেশ চেতনার সমৃদ্ধিতে এ বই যদি কিছুটা অবদান রাখে তাহলেই এর রচনা সার্থক হবে।

আবদুল্লাহ আল–মুতী

www.banglainternet.com

Goto List

পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে

সারা পৃথিবী জুড়ে পরিবেশের সংকট যে ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে এটা আজ আর বিতর্কের বিষয় নয়। প্রথম প্রথম বলা হত আঠার-উনিশ শতকে ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব ও তার পরবর্তী কালে পৃথিবী জুড়ে নানা ধরনের প্রযুক্তিগত উন্নয়নই মূলত পরিবেশের এসব সমস্যার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু ক্রমেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে, শুধু প্রযুক্তির ওপর দোষ চাপিয়ে এর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়, সমস্যার শেকড় রয়েছে আরো গভীরে।

চারদিকে পরিবেশের অবনতির লক্ষণ আজ অতি স্পষ্ট। খনিজ জ্বালানিতে যেসব শিল্প-কারখানা চলে সেগুলো দিন-রাত বিপুল পরিমাণ ধোঁয়া আর নানারকম বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশের বায়ুমণ্ডলে। তার অনেকটাই আবার ক্রমে ক্রমে মাটিতে এসে পড়ছে ভুসাকালি আর অম্লবৃষ্টির আকারে; তার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে ধোঁয়াশা, নষ্ট হচ্ছে বনভূমি, ধ্বংস হচ্ছে পুকুর-হ্রদ-নদীর জীবকুল। নানা ধরনের ছোট-বড় শিল্প-কারখানা যার বেশির ভাগেরই অবস্থান কোনো জলাশয়ের কিনারায় সেসব জলাশয়ের পানিতে ফেলছে বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত বর্জ্য দ্রব্য, তাতে পানির মারাত্মক দূষণ ঘটছে। জমি থেকে আরো বেশি ফসল পাবার তাগিদে ক্রমেই বেশি করে ব্যবহৃত হচ্ছে রাসায়নিক সার আর কীটনাশক। তাতে শুধু যে জমির গুণাগুণ নষ্ট হচ্ছে তা নয়, সেসবের অনেকটাই বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়ে পড়ছে নানারকম জলাশয়ে—কখনও আমাদের খাবার পানিতে। বাতাস, মাটি আর পানির এসব দূষণ পদার্থ প্রায়শ আশ্রয় নিচ্ছে গাছপালা, পাখি, জীবজন্তু, এমন কি মানুষের দেহে। তার ফলে নানারকম রোগের সৃষ্টি তো হচ্ছেই, অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ আর প্রাণী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক থেকে।

এই প্রক্রিয়ায় একটা বড় জায়গা দখল করে আছে পৃথিবী জুড়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি। মানুষের সৃষ্টির সময় থেকে শুরু করে শিল্প-বিপ্লবের সময় পর্যন্ত আসতে আসতে পৃথিবীর জনসংখ্যা

www.banglainternet.com

Goto List

বেড়ে দাঁড়িয়েছিল মোটামুটি এক শ' কোটি, অথচ আজ পৃথিবীতে এই পরিমাণ মানুষ বাড়ছে প্রতি দশ বছরে। যত মানুষ বাড়ছে তত জমি দখল হচ্ছে তাদের বাসভূমির জন্য, চাষবাসের জন্য, আরো নানা পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য। সে সব বাড়তি মানুষ পরিবেশের জন্য সৃষ্টি করছে আরো বেশি বেশি দূষণযুক্ত বর্জ্য বস্তু।

কিন্তু শুধু মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি আর তার প্রযুক্তির বিকাশই কি পরিবেশের মূল সমস্যা? প্রথম দিকে এমন একটা ধারণা তৈরি হলেও ক্রমেই মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে, আসলে পরিবেশের অবনতির মূলে যতটা না দায়ী প্রযুক্তির বিকাশ তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে দায়ী পরিবেশের ভারসাম্যের দিকে না তাকিয়ে অনেকটা বল্গাছাড়া গোছের উন্নয়ন। এর ফলে ক্রমে ক্রমে 'টেকসই' এবং 'প্রকৃতির সঙ্গে সুসমঞ্জস' উন্নয়নের ধারণা মানুষের মনে দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৭২ সালে জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম-এ মানব-পরিবেশ সংক্রান্ত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে পরিবেশের অবনতির দু'টি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হল উন্নত দেশগুলোতে অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অতি ভোগ, আর তার বিপরীতে বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে বিদ্যমান গভীর দারিদ্র। আশির দশকের মাঝামাঝি জাতিসঙ্ঘ নিয়োজিত পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিশনের রিপোর্ট (পরবর্তীকালে 'ব্রুন্ট্‌ল্যান্ড রিপোর্ট' নামে পরিচিত) ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়; তাতেও হুবহু এই বিষয়গুলোর ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে।

তারপর মানব-পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দু'দশক পূর্তি উপলক্ষে সম্প্রতি (১৯৯২ সালে) ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো-তে অনুষ্ঠিত হল পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ে দ্বিতীয় জাতিসঙ্ঘ সম্মেলন। তাতে যোগ দিলেন দুনিয়ার নানা দেশের রাষ্ট্রপতি বা কাছাকাছি পর্যায়ের শীর্ষনেতারা; সেজন্য এর আরেক নামকরণ হল 'ধরিত্রী শীর্ষ-সম্মেলন'। এই ধরিত্রী সম্মেলনে আবারও শিল্পোন্নত দেশগুলোতে অতিভোগ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মানুষের চরম দারিদ্রের বিষয় বড় করে তুলে ধরা হয়। উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের কতকগুলো বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে এই সম্মেলন থেকে 'উন্নয়ন ও দারিদ্র সংক্রান্ত বিশ্ব ফোরাম' নামে একটি নতুন সংস্থা চালু করা হয়। এই ফোরামের প্রাথমিক ঘোষণায় বলা হয়, দরিদ্র মানুষরাই হল পরিবেশের অবনতির এবং সেকারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সবচেয়ে বড় শিকার। সম্পদশালীরা সচরাচর পৃথিবীর নানা সম্পদ প্রচুর পরিমাণে ভোগ করেই যেতে থাকে; অথচ দরিদ্ররা তাদের বেঁচে থাকার মতো খোরাকও জোটাতে পারে না। তাই শেষ বিচারে পৃথিবী থেকে এই অতিদারিদ্রের সমস্যার সমাধান না করে পরিবেশের সমস্যার সমাধান কিছুতেই করা যাবে না।

আজকের পরিবেশ পরিস্থিতি

এই শতকের ষাটের দশকের গোড়া থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে, পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যেভাবে দ্রুত বেড়ে চলেছে তাতে জমি, গাছপালা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বেশ চাপ পড়ছে; এর সঙ্গে প্রকৃতির সুস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা না করে বল্গাহীন

www.banglainternet.com

Goto List

ভোগ যোগ হওয়ায় মানুষ তার চারপাশের প্রকৃতিতে যতটা উন্নয়ন ঘটাচ্ছে তার অনেকটাই আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পরিবেশের ওপর সেসবের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে। প্রযুক্তি বিকাশের প্রথম দিকে প্রকৃতিকে দেখা হত অনেকটা যেন প্রতিপক্ষের মতো, বলা হত আমরা প্রকৃতিকে 'ব্যবহার করতে' চাই, 'জয় করতে' চাই। আজকে এই ধারণা অনেকখানি পরিমাণে বদলেছে। আজ আমরা দেখছি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীটাই মানুষের একমাত্র আবাসস্থল; আর এই আবাসস্থলের সব রকম সম্পদ বেহিসেবী ভোগের ফলে এখানকার জীবন ব্যবস্থার ভারসাম্য আজ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। তার ফলে নিছক 'ব্যবহার' আর 'জয়' নয়, বরং 'টেকসই উন্নয়ন'-এর মাধ্যমে প্রকৃতি এবং তার সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে 'রক্ষা' এবং 'সংরক্ষণ'-এর প্রয়োজনটাই বিশেষভাবে জরুরি হয়ে উঠেছে।

আজকের পরিবেশের সমস্যার কতকগুলো বাস্তব চিত্র তুলে ধরলেই বোঝা যাবে পৃথিবীর স্বাস্থ্য আজ কী রকম সংকটজনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে:

- বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে; দু'শ বছর আগে অর্থাৎ ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের শুরুতে, এই হার ছিল প্রতি লক্ষ ভাগে মোটামুটি ২৮০ ভাগ, ১৯৭২ সালে এটা হয় প্রতি লক্ষে ৩২৭ ভাগ, ১৯৯৫ সালে সেটা এখন ৩৬০ ভাগের ওপরে।
- গত এক দশকে পৃথিবীর নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের পরিমাণ ১৯০ কোটি হেক্টর থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১৭০ কোটি হেক্টর; প্রতি বছর বনাঞ্চলের পরিমাণ কমছে প্রায় এক শতাংশ হারে (বাংলাদেশে এই হার প্রায় দু'শতাংশ)।
- সারা পৃথিবীতে প্রায় এক কোটি প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে (যদিও এযাবৎ তালিকাবদ্ধ হয়েছে মাত্র ১৫ লক্ষের মতো); তার মধ্যে গত মাত্র দু'দশকেই প্রায় দশ লক্ষ প্রজাতি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে; সত্তরের দশকে প্রতি বছর প্রজাতি ধ্বংসের হার ছিল মোটামুটি ৩০,০০০, দু'দশক পর সে হার আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে বছরে ৫০,০০০-এর ওপরে।
- অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা আজ অতি দ্রুত হারে বাড়ছে; ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে ২৫০ কোটি থেকে ৫০০ কোটি হয়েছিল, মনে হচ্ছে ২০৫০ সালের মধ্যে এই অঙ্ক আবার দ্বিগুণ হয়ে ১,০০০ কোটিতে দাঁড়াবে। মাত্র আগামী দু'দশকে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়বে প্রায় ১৭০ কোটি; এই শতাব্দীর শুরুতে সারা পৃথিবীতে যত মানুষ বাস করত এই অঙ্ক তার সমান।

পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনায় সারা পৃথিবীতে আজ একটি প্রশ্ন বেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে: সে হল পরিবেশের এই গুরুতর সংকট সৃষ্টির পেছনে প্রধানত কে দায়ী আর এ সমস্যার প্রতিকারের প্রধান দায়িত্বই বা কার। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা সারা

www.banglainternet.com

Goto List

পৃথিবীর লোকসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশ, অথচ তারা সারা পৃথিবীর খনিজ জ্বালানির ২৫ শতাংশ ব্যবহার করে, আর সৃষ্টি করে পৃথিবীর সব কার্বন ডাই-অক্সাইডের ২২ শতাংশ। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ৭৮ শতাংশ; তারা ব্যবহার করে পৃথিবীর মোট খনিজ উৎপাদনের মাত্র ১২ শতাংশ আর বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রায় ১৮ শতাংশ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকর গ্রীনহাউস গ্যাস সঞ্চারেও তাদের অবদান সেই অনুপাতে। এমনি নানা তথ্য থেকে আজ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো আজ যে সব জটিল পরিবেশগত সমস্যার মুখোমুখো তার অনেকগুলোরই মূলে রয়েছে উন্নত দেশগুলোতে মানুষের অতিভোগের প্রবণতা। আর এসব সমস্যার কারণ সন্ধান এবং সেসবের প্রতিকারের দায়িত্বও তাই অনেকটাই বর্তায় পাশ্চাত্যের উন্নত ধনী দেশগুলোর ওপরে।

সেদিক থেকে দেখলে বাংলাদেশে এখনও তেমন শিল্পায়ন ঘটে নি, কাজেই বাংলাদেশ তেমন বড় আকারে কার্বন ডাই-অক্সাইড বা অন্য দূষণবস্তু উৎপাদন করে না, অথচ মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সব জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছে তার দায় ভাগ অনেকটাই এসে পড়ছে হতভাগ্য বাংলাদেশের ওপরে। কিছু কিছু গবেষণা থেকে দেখা গেছে, শিল্পায়নের প্রথম পর্যায়ে যে সব শিল্প স্থাপন করা হয় তার চাইতে উন্নততর পর্যায়ের শিল্প অপেক্ষাকৃত কম দূষণের জন্ম দেয়। কাজেই সমগ্র পৃথিবীর পরিবেশের স্বার্থে যেসব দেশ এখনও শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, শিল্পোন্নত দেশগুলোর কর্তব্য হল উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞানের অংশীদার করে তাদের সহায়তা দান করা; দূষণ-নিরোধী যেসব প্রযুক্তি এখনও কেবল উন্নত দেশগুলোতে লভ্য সেগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে অবাধে সরবরাহ করা। কিন্তু তারা যে তা করতে চাইবে এমন কোন লক্ষণ এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

সম্পদের বিপুল বৈষম্য

১৯৭২ সালে যখন জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে বিশ্বপরিবেশ নিয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল তার পর থেকে পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে; কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থায় যে অন্তর্নিহিত বৈষম্য তা না কমে বরং ক্রমাগত আরো বেড়েই চলেছে। এর ফলে পৃথিবীর সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যে অবনতি ঘটছে তা অল্প কিছু দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হবে:

- পৃথিবীতে আজ যে ১৮৫টি দেশ জাতিসঙ্ঘের সদস্য তাদের মধ্যে মাত্র ৫০টি দেশের মানুষ তাদের খাদ্যে দৈনিক ক্যালরি চাহিদা মেটাতে পারে; পৃথিবীর প্রায় ৫৭০ কোটি মানুষের মধ্যে অন্তত ৮০ কোটি নিয়মিত ক্ষুধার্ত থাকে।
- পৃথিবীর মোট বয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় এক শ' কোটি লোক এখনও রয়েছে নিরক্ষর; প্রাথমিক স্তরে শিশুদের ঝরে পড়ার হার অন্তত ৩০ শতাংশ। পৃথিবীর সব নিরক্ষর মানুষের দুই-তৃতীয়াংশই হল নারী।

www.banglainternet.com

Goto List

শিল্পোন্নত দেশগুলোর লোকসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ, অথচ তারা ব্যবহার করে উন্নয়নশীল দেশের মানুষের তুলনায় প্রায় দশ গুণ বেশি বাণিজ্যিক জ্বালানি; আর এরা পৃথিবীর মোট কার্বন ডাই-অক্সাইডের ৭১ শিতাংশ এবং মোট শিল্পবর্জ্যের ৬৮ শতাংশ উৎপন্ন করে।

শিল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে যে সাহায্য দেয় তাতেও প্রধানত রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করে; যে দশটি দেশে পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ গরিব মানুষের বাস তারা পায় এই সাহায্যের মাত্র এক-চতুর্থাংশ। যেমন অপেক্ষাকৃত ধনী দেশ হল সালভাদর, যার লোকসংখ্যা বাংলাদেশের তুলনায় মাত্র চার শতাংশ আর মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের চার গুণ, সে আমেরিকার কাছ থেকে বাংলাদেশের চেয়ে ঢের বেশি সাহায্য পায়।

১৯৮০-র দশকে এসে দেখা গেল, যদিও নানাক্ষেত্রে দুনিয়া জুড়ে সাধারণভাবে মানুষের অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে, গোটা পৃথিবীর স্বাস্থ্যের যেন ক্রমেই অবনতি ঘটছে! পৃথিবী জুড়ে বনভূমির পরিমাণ কমে আসছে, মরু অঞ্চল বিস্তৃত হচ্ছে, মৃত্তিকার ক্ষয় ঘটছে, উদ্ভিদ আর প্রাণী প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। আকাশের উঁচু স্তরে রয়েছে ওজোন গ্যাসের এক হালকা স্তর, তা আমাদের এবং সব ধরনের জীবদেহকে ক্ষতিকর তীব্র সৌরকিরণ থেকে রক্ষা করে; এই ওজোন স্তর ক্রমেই হালকা হয়ে আসছে; আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি যেসব ক্ষতিকর গ্যাস গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বায়ুমণ্ডলে সেগুলোর পরিমাণ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩-১৪ জুন ১৯৯২ ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে যে "ধরিত্রী শীর্ষ-সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয় তাতে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্ব পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য একটি বিশ্ব-সনদে স্বাক্ষর দেন; এছাড়া আগামী একুশ শতকে পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রধান প্রধান সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য "এজেন্ডা ২১" নামে একটি কর্মসূচির দলিলও গৃহীত হয়। কিন্তু এই সম্মেলন দুনিয়ার মানুষের মনে যে বিপুল আশার জন্ম দিয়েছিল তা পূরণ হবার কোন লক্ষণ এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না; পরিবেশের মূল সমস্যাগুলোর সমাধানেও এখনও তেমন কোন অগ্রগতি ঘটে নি।

বাংলাদেশের পরিবেশ

বাংলাদেশের নদীমেখলা কৃষিভিত্তিক জীবন এদেশের মানুষকে স্বভাবতই পরিবেশ সচেতন করে তোলে, পরিবেশকে ভালবাসতে শেখায়। তাই এদেশের মানুষ সহজেই হয়ে ওঠে প্রকৃতিপ্রেমিক। আবার অতি ঘন জনবসতি, প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ ভৌগোলিক অবস্থান এসব এদেশের মানুষকে পরিবেশের বিপর্যয়ের নিয়মিত শিকারে পরিণত করে। এর ফলে এদেশের নীতি নির্ধারক মহল এবং জনগণ গত ক'বছরে সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, আসলে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ এবং পৃথিবীর পরিবেশের

www.banglainternet.com

Goto List

ওপর আজ মানুষ নিরন্তর যত অত্যাচার করে চলেছে তা তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাবার উপক্রম হয়েছে।

ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর বদ্বীপ অঞ্চলগুলোর একটিতে। এদেশের জলবায়ু এমন যে, সারা বছরই এখানে কোন না কোন ফসল ফলানো যায়। এদেশের বিস্তৃত জলা জায়গাগুলোতেও রয়েছে প্রচুর সম্পদ—নানা জাতের মাছ, চিংড়ি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী। অবশ্য প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা, উচ্চ জনবসতি (বর্তমানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮০০-র ওপরে) ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হারের কারণে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের শুধু যে দ্রুত অবনতি ঘটছে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা নিঃশেষিতই হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের একটি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হল তার বিপুল জলা অঞ্চল। বাংলাদেশের জলা অঞ্চলের পরিমাণ নানাভাবে হিসেব করা হয়ে থাকে: তবে মোটামুটি হিসেবে তা ৭০-৮০ লক্ষ হেক্টর অর্থাৎ দেশের মোট আয়তনের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বলে ধরা যেতে পারে। বর্ষার সময় কোন কোন বছর দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এলাকাই জলা অঞ্চলে পরিণত হয়। এমন বিপুল জলা অঞ্চলে বাস করে নানা জাতের বন্য প্রাণী। অসংখ্য নদী, হাওর-বাওরে আছে বহু বিচিত্র প্রজাতির মাছ। বাংলাদেশে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মিঠা পানির মাছের খবর জানা গেছে। খাল-বিলে দেখা যায় প্রায় ১৫০ জাতের জলজ পাখি। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় জলা অঞ্চলে এবং হাওর এলাকায় ধান হল প্রধান ফসল।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনবসতির কারণে জলা অঞ্চলগুলোতে মাছ ধরার নিবিড়তা ক্রমেই বাড়ছে। শুকনোর সময়ে দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলোতে মিঠা পানির সরবরাহ অনেকটা কমে আসে: তখন নদীর খাড়িতে ব্যাপকভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে লোনা পানি এসে ঢোকার কারণে সুন্দরবন এলাকায় 'ম্যানগ্রোভ' বা গরানবনের পরিবেশ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সুন্দরবন অঞ্চলের গাছপালা ব্যাপকভাবে কেটে ফেলা হচ্ছে; এসবও মৎস্য সম্পদ ধ্বংস হবার বড় কারণ। মিঠা পানির জলা অঞ্চলগুলোর অবনতির প্রধান কারণ হিসেবে নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায়:

জনবিস্ফোরণ: জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের সর্বত্র বাসস্থান ও চাষের জমির ওপর বিপুল চাপ পড়ছে। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে জলা জমি ভরাট করে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাতে মাছের আবাসস্থল নষ্ট হয়ে তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং গ্রামের লোকজন তাদের খাদ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন উপাদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষি জমিতে যে সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তার অনেকটাই ধুয়ে নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে গিয়ে পড়ে এবং সেগুলো পানির অক্সিজেন সরবরাহ কমিয়ে দিয়ে ও বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে নানা রকম জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়। একইভাবে বড় শহর অঞ্চলগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য নদীর পানিতে পড়ে তাতে ব্যাপক দূষণ ঘটাচ্ছে।

শিল্পদূষণ: বাংলাদেশে ছোট-বড় বেশির ভাগ শিল্প-কারখানাই নদীর কিনারায় অবস্থিত। এর মধ্যে আছে কাগজ ও মণ্ডের কল, কস্টিক-ক্লোরিন কারখানা, ট্যানারি, সার কারখানা, পাটকল, সুতাকল, কাপড়ের কল ইত্যাদি। এসব শিল্প-কারখানা থেকে যেসব তরল বর্জ্য

www.banglainternet.com

Goto List

নিঃসৃত হয় তা নদীর পানির অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়।

সার ও কীটনাশক: কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য সার ও কীটনাশকের ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে। গত দশ বছরে বাংলাদেশে মোট রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রায় দশ লক্ষ টন থেকে বেড়ে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় জানা গেছে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারে প্রথম অবস্থায় ফসলের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ে। কিন্তু পরে দেখা যায় অতিরিক্ত সার ও কীটনাশকের ব্যবহার জমির গুণাগুণ নষ্ট করে ফেলে; তাছাড়া এসব ধুয়ে জলাশয়ে বিস্তৃত হয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে। তাতে শেষ পর্যন্ত নানারকম পোকামাকড়ের দেহে প্রতিরোধ শক্তি জন্মায় এবং তখন আর উৎপাদন তেমন বৃদ্ধি পায় না।

ভূমিক্ষয় ও পলি পড়া: গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা মিলে যে নদীসমষ্টি সারা বাংলাদেশকে বেষ্টন করে আছে তা প্রতি বছর প্রায় ২৪০ কোটি টন পলি আর তলানি বয়ে নেয়; এর বেশির ভাগই হল নদীর পাড় ভাঙ্গা থেকে উৎপন্ন। এ ধরনের পাড় ভাঙ্গার ফলে প্রায়শ উর্বর কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে আর নদীর খাত ভরাট হয়ে গিয়ে তার বাস্তসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ভৌত নির্মাণ: সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে অনেক রাস্তাঘাট তৈরির সময় পানির স্বাভাবিক প্রবাহের দিকের কথা মনে রাখা হয় নি। এর ফলে পানির নিয়মিত প্রবাহ ব্যাহত হয়ে কোথাও কোথাও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে, আবার অন্যত্র পানির অভাব দেখা দিয়েছে। তেমনি বন্যা ঠেকাবার জন্য অনেক নদীতে বাঁধ প্রভৃতি তৈরি করা হয়েছে কিন্তু এসব নির্মাণের দীর্ঘকালীন পরিবেশগত ফল কি হবে তা বিবেচনা করে দেখা হয় নি। এ ধরনের নির্মাণের কারণে নদীর খাতে তলানি পড়ার হার বেড়েছে, তাতে পানির প্রবাহ কমে গিয়েছে এবং অবশেষে আরো বড় ধরনের বন্যা ঘটছে। সেজন্য সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের উদ্যোগে যে 'বন্যা নিরোধ কর্মপরিকল্পনা' হাতে নেওয়া হয়েছে তার তীব্র সমালোচনা করা হচ্ছে। সবগুলো বড় নদীর ধারে উঁচু বাঁধ দিয়ে বর্ষাকালীন পানির প্রবাহ নদীর খাতে সীমাবদ্ধ রাখা এই পরিকল্পনার একটি প্রধান দিক। অনেক বিশেষজ্ঞ এ পরিকল্পনার নানা ক্ষতিকর পরিবেশগত অভিঘাতের আশংকার কথা বলছেন: যেমন হঠাৎ কোন কারণে কোথাও বাঁধ ভেঙ্গে গেলে বা ক্রমে ক্রমে তলানি পড়ার ফলে নদীর তলা উঁচু হয়ে উঠলে দেশের জলা অঞ্চলগুলোর ওপর এবং বন্য প্রাণীদের ওপর তার বড় রকম বিরূপ প্রভাব পড়বে।

'উন্নয়ন' থেকে ক্ষতি

কথাটা শুনতে কিছুটা অদ্ভুত শোনায়, কিন্তু কখনও দেখা যায় সরকার বা আর কোন সংস্থার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে নানা রকম অপ্রত্যাশিত পরিবেশগত সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সে উন্নয়ন হতে পারে কৃষির, শিল্পের অথবা আর কোন ক্ষেত্রের। এমনিতেই মানুষের সভ্যতা বিস্তারের

www.banglainternet.com

Goto List

ফলে নানারকম উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাতে তাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান সম্পদ হল অপেক্ষাকৃত ছোট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ব্যাপক বৈচিত্র্য। এদেশে এ যাবৎ ১২৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৫৭৯ প্রজাতির পাখি, ১২৪ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ১৯ প্রজাতির উভচরের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। এসব উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন যাত্রার ওপর তীরভূমি উদ্ধার, কৃষিজমির বিস্তার, নদী ভাঙ্গনের ফলে বড় নদীগুলোর অববাহিকায় অতিরিক্ত পলিপড়া—এ ধরনের পরিবেশগত পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। এর ফলে অনেক বড় আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি ও সরীসৃপ সাম্প্রতিক কালে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে; অবিলম্বে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আরো অনেকগুলো শীগ্‌গিরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অবস্থা বর্তমানে এমন সঙ্গিন হয়ে উঠেছে যে, মনে করা হয় দেশের মোট প্রায় ৮৪৭ প্রজাতির মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে ১৫টি মাত্র গত কয়েক দশকে বিলুপ্ত হয়েছে এবং আরো ৩৩টি প্রজাতি বিলুপ্ত হবার পথে।

পরিবেশের অবনতির ফলে পৃথিবীর এ অঞ্চলে সাম্প্রতিক কালে বন্যা, সাইক্লোন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েছে; বাংলাদেশের ওপর তার বড় রকম প্রভাব পড়ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন ঘন ঘন বন্যা, আরো বেশি ভূমিক্ষয়, অস্বাভাবিক খরা এবং গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা আরো সংকটজনক হয়ে উঠবে।

অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতিতে ভাল খবর যে কিছুই নেই তা নয়। গত দু'দশকে বাংলাদেশের সরকার পরিবেশের সংরক্ষণের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। ১৯৮২ সালে একটি পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ সৃষ্টি করা হয়; পরবর্তীকালে এটিকে পরিবেশ অধিদপ্তর নামকরণ করা হয় এবং ১৯৮৯ সালে নবগঠিত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। ১৯৮০-র দশক জুড়ে দেশে পরিবেশের নানা সমস্যা নিয়ে সচেতনতার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৯০ সালকে পালন করা হয় 'পরিবেশ বর্ষ' হিসেবে; ১৯৯১-৯৯ সালকে পালন করা হচ্ছে 'পরিবেশ দশক' হিসেবে। দেশে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে সরকার দেশ থেকে ব্যাঙের পা এবং সব রকম পশু-পাখির রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছেন। নতুন পলিথিন ব্যাগ তৈরির কারখানা স্থাপনও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপ সরকার ও জনগণের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়ে আগ্রহের পরিচয় দেয়। একটি জাতীয় পরিবেশ নীতি চূড়ান্ত করা হয়েছে; আশা করা যায় তার বাস্তবায়ন অদূর ভবিষ্যতে দেশের পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট অবদান রাখবে।

দারিদ্র ও পরিবেশ পরিকল্পনা

এটা সবারই জানা যে, বাংলাদেশে দারিদ্র সর্বব্যাপী। দেশের মাথা পিছু জাতীয় আয় গড়ে মাত্র ২১০ ডলার, আর দেশে এ যাবৎ তেমন কোন খনিজ সম্পদ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

www.banglainternet.com

Goto List

আজ থেকে দু' শ'-আড়াই শ' বছর আগে অর্থাৎ ইংরেজদের আবির্ভাবের সময়ে, এদেশ দুনিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ বলে বিবেচিত হত: কিন্তু আজ বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। আরো বেশি উদ্বেগের ব্যাপার হল দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন ঘটছে না। জাতিসঙ্ঘ উন্নয়ন কর্মসূচির একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে:

> সম্পদের অপ্রতুলতা, বিশেষ করে সরকারী পর্যায়ে, ক্রমেই বেশি করে প্রকট হয়ে উঠছে। ... প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ জনশক্তি কোন উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত নয়। দক্ষতা ও সাক্ষরতার রয়েছে দারুণ অভাব। ... প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পরিবার তাদের নিম্নতম দৈনন্দিন খরচ মেটাতে পারে না। গত ২০ বছরের মধ্যে এ অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি এবং এর প্রভাব পড়ছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে।
>
> (*Human Development in Bangladesh*. Dhaka: UNDP, 1992, pp. 44-45)

এই একই রিপোর্টে বলা হয়েছে, এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে যাদের প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম বাংলাদেশ তাদের দলে পড়ে। বাংলাদেশে মানুষের গড় প্রত্যাশিত আয়ু মাত্র ৫২ বছর, আর এদেশটি দুনিয়ার মাত্র তিনটি দেশের মধ্যে একটি যেখানে মেয়েদের গড় আয়ু পুরুষদের তুলনায় কম। এদেশে গড়ে পাঁচটি শিশুর মধ্যে একটি মারা যায় পাঁচ বছর বয়স হবার আগেই; এই শিশু মৃত্যুর হার দুনিয়ার ১০৬টি দেশের ওপরে। ১৯৩৭ ও ১৯৮৬ সালের মধ্যে পাঁচ দশকে বাংলাদেশে দৈনিক মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ২,৭৪৩ থেকে নেমে হয়েছে মাত্র ১,৯২৭; এই কমার ধারা এখনও অব্যাহত আছে। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক রয়েছে দারিদ্র সীমার নিচে, কাজেই তাদের ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ স্বভাবতই এই গড় হারের চেয়েও কম।

এমন দুর্গত অবস্থায় স্বভাবতই দেশের জনগণের চরম দারিদ্রের লাঘব না করে সুস্থ পরিবেশ রচনার উদ্যোগ গ্রহণ একেবারে সাধ্য না হলেও হবে একান্তই দুরূহ কাজ। এই পরিপ্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কেউ কেউ উন্নয়ন আর পরিবেশকে দেখেন দুই প্রতিপক্ষ হিসেবে: যেন এরা পরস্পরের একেবারে বিপরীত। আসলে উন্নয়ন আর সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যবস্থাপনা হবার কথা পরস্পরের সহযাত্রী ও পরিপূরক। পরিবেশের সংরক্ষণ হল উন্নয়নেরই একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ। যথাযথ পরিবেশ সংরক্ষণ ছাড়া উন্নয়নের সকল উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে উন্নয়ন না ঘটলে বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট সম্পদ জুটবে না এবং পরিবেশ সংরক্ষণের সব উদ্যোগ হবে ব্যর্থ। উন্নয়নশীল দেশগুলো স্বভাবতই উন্নয়ন ছাড়া টিকতে পারে না। তাদের উন্নয়নের গতি কমাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না, বরং এই গতি আরো ত্বরান্বিত করা দরকার। তাদের আরো বেশি করে প্রযুক্তি ব্যবহারও প্রয়োজন; তবে সে প্রযুক্তি হতে হবে যথাযথ ধরনের, কম অপচয়মূলক, কম দূষণকারী, বেশি দক্ষ এবং পরিবেশের জন্য অনুকূল।

www.banglainternet.com

Goto List

গত ক'বছরের পরিবেশবাদী আন্দোলনের একটি মূল্যবান শিক্ষা হল পরিবেশের সমস্যা যেহেতু সমগ্র জন সমাজকে স্পর্শ করে, কাজেই পরিবেশের সংরক্ষণের ব্যাপারেও সমগ্র জন সমাজকেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এজন্য একটি জরুরি প্রয়োজন হল সমগ্র জনগণের মধ্যে বুনিয়াদি শিক্ষার বিস্তার। প্রায়শ জনগণ অজ্ঞতাবশত পরিবেশের ক্ষতি করে বসে। সারা পৃথিবীতে আজ প্রায় ৯৪ কোটি লোক রয়েছে নিরক্ষর,তাদের মধ্যে ৯০ শতাংশেরই বাস হল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এ অবস্থার আশু পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশে মোট বয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশ লিখতে পড়তে পারে না। প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবাই স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না; আবার যারা যায় তাদের মধ্যেও অর্ধেকের বেশি প্রাথমিক স্কুল শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। এদেশে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু শুধু এই ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। দেশের অন্তত ৮০ শতাংশ ছেলেমেয়ের জন্য আট-বছর মেয়াদী বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে দেশের বিপুল সংখ্যক বয়স্ক মানুষের জন্যও চাই উপানুষ্ঠানিক বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা। এই বুনিয়াদি শিক্ষায় ভাষা সাক্ষরতা ও গণিত সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশগত ও প্রযুক্তিগত সাক্ষরতাও সব মানুষের কাছে লভ্য করে তোলা প্রয়োজন।

সমস্যার দু'মুখো সমাধান

সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের মতো অতি দরিদ্র একটি দেশে দারিদ্র দূর করার উদ্যোগ আর প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উদ্যোগ হাত ধরাধরি করে চলতে হবে। একেবারে দরিদ্র যারা তাদের স্বনির্ভর হয়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করার সুযোগ করে দিতে হবে যাতে তারা নিজে থেকেই পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। এভাবেই শুধু আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসের উপযোগী দেশ উপহার দিয়ে যেতে পারব।

পরিবেশের সমস্যার সমাধানের জন্য দু'পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে: রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় পর্যায় এবং স্থানীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়। জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনায় যেমন পরিবেশ সম্পর্কে কতকগুলো বিশেষ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে তেমনি সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিটি পরিকল্পনায় পরিবেশ সংক্রান্ত বিবেচনাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি ছাড়াও এমন অনেক পদক্ষেপ রয়েছে যা ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত হতে পারে। এসব পদক্ষেপের প্রধান লক্ষ্য হবে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং পরিবেশের ভারসাম্যকে সুসংহত করা। এমন কি অনেক ছোটখাট কাজের মধ্য দিয়ে আমরা ব্যক্তিগতভাবে পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারি।

আমাদের পূর্বপুরুষদের চাইতে আমাদের সামনে প্রকৃতি ও পরিবেশকে বোঝার এবং তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করবার সুযোগ অনেক বেশি। সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি

www.banglainternet.com

Goto List

ও সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে নানা অগ্রগতি আমাদের অনেক নতুন নতুন উপলব্ধি ও হাতিয়ার দিয়েছে। আজ এমন সব নীতি এবং কার্যসূচি গ্রহণ করতে হবে যা পরিবেশের সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করবে, বিরল সম্পদের বিকল্প উদ্ভাবনে উৎসাহিত করবে এবং পরিবেশের সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তা দেবে।

www.banglainternet.com

Goto List

গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া সমাচার

আমাদের চারপাশের পৃথিবী যে দ্রুত বদলে যাচ্ছে তা সহজে মেনে নেওয়া আজো অনেকের পক্ষেই বেশ শক্ত। তাই দেখা যায় এই বিশ শতকের শেষেও এমন লোকের অভাব নেই যারা মনে করে এই পৃথিবীটা সেই প্রথম সৃষ্টির সময়ে যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনি রয়েছে; শুধু বেড়েছে মানুষ—আর বদলেছে তাদের পোশাক-আশাক, কথা বলার ধরন। তবে সুখের বিষয় এ রকম লোকের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। বেশির ভাগ লোক আজ মনে করে আগের দিনের চাইতে পৃথিবী অনেক বদলে গিয়েছে—আর এখনও ক্রমেই বদলে যাচ্ছে।

আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ের চাইতে আজকের দিনের একটা বড় পার্থক্য হল আগে চারপাশের বেশির ভাগ পরিবর্তন ঘটত খুব ধীরে ধীরে—নেহাতই যাকে বলা যায় 'প্রাকৃতিক নিয়মে'। কিন্তু আজ এমনি ধারার প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের প্রভাব যোগ হয়েছে। মানুষ কখনো জেনেশুনে আবার কখনো নিজেদের অজান্তেই প্রকৃতির ওপর নানা ধরনের 'খোদকারি' করে চলেছে। তাতে আমাদের চারপাশে নানা পরিবর্তন ঘটছে বেশ দ্রুত তালে। অল্পদিনের মধ্যেই চোখে পড়ছে প্রকৃতিতে নানা ধরনের রদ-বদল।

ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে অর্থাৎ গত দু'শ বছরে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে দ্রুত। বাড়তে বাড়তে আজ প্রতি দশ বছরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়ছে মোটামুটি এক শ' কোটি, অথচ পৃথিবীতে এই পরিমাণ মানুষ হতে লেগেছিল ইতিহাসের একেবারে শুরু থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সময়। সারা পৃথিবী জুড়ে যত মানুষ বাড়ছে তত তারা গড়ে তুলছে অসংখ্য শহর-বন্দর, পথঘাট। গাছ কেটে সাফ করছে বন-জঙ্গল; কোথাও ভরাট করছে জলা জায়গা, কোথাও নদীতে দিচ্ছে বাঁধ। দু'এক প্রজন্মের মধ্যেই কোথাও নদীতে চড়া জেগে পত্তন হচ্ছে ফসলী জমি, আবার কোথাও উর্বর আবাদী জমি হয়ে যাচ্ছে ধু ধু মরুভূমি। আর এসব শুধুই যে চারপাশের গাছপালা, পশুপাখির ওপর ছাপ ফেলছে তা নয়, বদলে দিচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ু, মানুষের জীবনযাত্রা।

www.banglainternet.com

Goto List

আরো একটি কারণে এসব পরিবর্তন আজ বেশ সহজে সবার চোখে পড়ছে। সে হল আগের চেয়ে মাপজোখের কায়দা আজ অনেক উন্নত হয়েছে: মানুষ আজ প্রকৃতির অনেক পরিবর্তনের মাপজোখ নিচ্ছে খুব সূক্ষ্মভাবে, নিয়মিত। প্রাচীনকালে ধীরে ধীরে যেসব পরিবর্তন ঘটত সেগুলো সহজে মানুষের চোখে পড়ত না; মানুষ টের পেত অনেকটা পরিবর্তন ঘটে যাবার পর। আজ বিজ্ঞানীরা অনবরত চারপাশের নানা মাপজোখ নিচ্ছেন। তার ফলে আমরা বুঝতে পারছি তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, হাওয়ার আর্দ্রতা এসব বছর বছর কতটা বাড়ছে বা কমছে। পৃথিবীর নানা জায়গার মাপজোখ নিয়ে সেসব হিসেব মেলানোও যাচ্ছে। তুলনা করা যাচ্ছে এক জায়গার সঙ্গে অন্য জায়গার; বের করা যাচ্ছে পরিবর্তনের গতিধারা; কখনো হদিস করা যাচ্ছে নানা রকম পরিবর্তনের ভেতরকার কার্যকারণ সম্বন্ধের। কিছুটা ভবিষ্যদ্বাণী করা যাচ্ছে আগামী দিনে কী ঘটতে পারে সেসব সম্ভাবনা নিয়ে।

এমনি সব মাপজোখ থেকে গত ক'দশক ধরে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করছেন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যেন ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। আমাদের দেশে আজ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মাপজোখ ছাড়াই সবাই বুঝতে পারছে গরম আর খরা যেন বেশি পড়ছে, আবহাওয়া আগের চাইতে বদলে যাচ্ছে। তবু বিজ্ঞানীদের কাছে তো মাপজোখের দাম কম নয়; তাঁরা মেপে বলছেন, ১৮৫০ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে অর্থাৎ গত প্রায় দেড় শ' বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি হল মোটামুটি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর যতদূর মনে হচ্ছে তাপমাত্রার এই বাড়া আগামী দিনেও চলতে থাকবে। এমনিতে শুনতে এক ডিগ্রি বৃদ্ধি তেমন কিছু মনে হয় না; কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানেন এমনি সামান্য পরিবর্তন থেকেই অতীতে অনেক বিশাল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যে কারণে আজ পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে উঠছে তাকে বলা হচ্ছে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া।

গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া কি?

নানা ধরনের উপাদানের কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকেই বলা হয় গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া। শীতের দেশে খুব ঠাণ্ডার সময়ে গাছপালা জন্মাবার জন্য এক ধরনের কাচের ঘর ব্যবহার করা হয়; তাকে বলা হয় গ্রীনহাউস বা কাচের কুঠি—সেই থেকেই এসেছে এই নাম। কাচের দেয়ালের একটা গুণ হল তার ভেতর দিয়ে ছোট মাপের আলোর ঢেউগুলো ঢুকতে পারে, কিন্তু তাতে ঘরের ভেতরটা গরম হয়ে উঠে লম্বা মাপের যে অবলোহিত তাপরশ্মি ছড়াতে থাকে তা আর এই কাচ ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে না। তার ফলে সে ঘরের ভেতরটা গরম থাকে। বায়ুমণ্ডলের কিছু কিছু গ্যাস যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন এরাও ঠিক এমনিভাবে সূর্যের তাপকে আটকে রাখে অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে যদি এ ধরনের গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে ওঠে তাহলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে উঠতে পারে।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ কিছুদিন ধরে ক্রমেই বেড়ে উঠছে। হাওয়ার প্রধান দুটো গ্যাস হল নাইট্রোজেন আর

www.banglainternet.com

Goto List

অক্সিজেন। নাইট্রোজেন থাকে শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ আর অক্সিজেন থাকে শতকরা প্রায় ২১ ভাগ। আরো থাকে আরগন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি নানা উপাদান। তাদের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ খুব সামান্যই—আয়তন হিসেবে প্রতি দশ হাজার ভাগে মাত্র তিন ভাগের মতো।

১৭৫০ সাল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল মোটামুটি প্রতি দশ হাজার ভাগে ২.৭৫ ভাগ; ১৯৫৯ সালে দাঁড়ায় ৩.১৬ ভাগ; ১৯৯৩ সালে হিসেব করা হয়েছে ৩.৫৭ ভাগ। পৃথিবীতে যে হারে কয়লা, তেল এসব খনিজ জ্বালানির ব্যবহার বাড়ছে আর বন-জঙ্গলের পরিমাণ কমছে তাতে মনে হয় একুশ শতকের মাঝামাঝি এই গ্যাসের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রতি দশ হাজারে চার থেকে ছ' ভাগ অর্থাৎ আজকের তুলনায় অন্তত ২৫ শতাংশ বেশি। এর ফলে পৃথিবীর আবহাওয়ায় নানা ধরনের গুরুতর প্রভাব পড়বে।

আগেই বলেছি, হাওয়ায় যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আছে সে অতি সামান্য মাত্রায়। আর এই সামান্য মাত্রায় থাকাটা আমাদের জন্য বেশ দরকারিও বটে। হাওয়ার এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গাছপালার সালোক সংশ্লেষণের জন্য খুব জরুরি। গাছপালায় সালোক সংশ্লেষণ না ঘটলে আমাদের খাবার-দাবার কিছুই জুটবে না। তাছাড়া হাওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড আদৌ না থাকলে পৃথিবী মহাশূন্যে তাড়াতাড়ি তাপ ছড়িয়ে দিয়ে অতিমাত্রায় ঠাণ্ডা হয়ে পড়ত। কিন্তু এই সামান্য মাত্রা গ্যাসের পরিমাণে যদি ওঠা-নামা ঘটে তবে তাতেও পৃথিবীর জলবায়ুতে ঘটতে পারে বড় রকম ওলট-পালট।

পৃথিবীর ওপর সূর্যের যে বিপুল শক্তি এসে পড়ে তার মোটামুটি অর্ধেক পৃথিবীর গায়ে পড়বার আগেই ঠিকরে যায় হাওয়ার আবরণ থেকে, মেঘ থেকে, বরফের স্তূপ থেকে। যে অর্ধেকটা পৃথিবী শুষে নেয় তারও বেশির ভাগ পৃথিবী আবার ছড়িয়ে দেয় লম্বা মাপের তাপরশ্মির আকারে। এসব তাপরশ্মির সবটা তা বলে পৃথিবী ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে না; অনেকটা আটকে পড়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে। এই আটকে দেবার ব্যাপারে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের একটা বড় ভূমিকা আছে। এর ভেতর দিয়ে সূর্যের ছোট মাপের আলোকতরঙ্গ সহজেই এসে পড়তে পারে পৃথিবীতে, কিন্তু এসব আলোকতরঙ্গ পৃথিবীর ওপর পড়ে যে বড় মাপের তাপতরঙ্গ সৃষ্টি হয় তা এই গ্যাসের বাধা ডিঙ্গিয়ে মহাশূন্যে পালিয়ে যেতে পারে না। বায়ুমণ্ডলের আরো যেসব গ্যাস এভাবে তাপ আটকে রাখতে পারে তার মধ্যে রয়েছে জলীয় বাষ্প, ক্লোরো-ফ্লুরোকার্বন (এই গ্যাসটি নানারকম স্প্রেতে এবং হিমায়ক ও শীতাতপ যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়), ওজোন, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি।

এই বিশ শতকে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে তিন গুণ — ১৭০ কোটি থেকে হয়েছে ৫৭০ কোটির ওপরে। কিন্তু এই সময়ে খনিজ জ্বালানির ব্যবহার বেড়েছে প্রায় পনের গুণ। এতে হাওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণও বাড়ছে; তার ফলে পৃথিবীতে বেশি বেশি তাপ আটকে থাকছে—বেড়ে উঠছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই হারে তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে ২০৩০ সালের কাছাকাছি পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়তে পারে

www.banglainternet.com

Goto List

আজকের চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তারপরও এই তাপমাত্রা বাড়া সম্ভবত চলতেই থাকবে। একুশ শতকের শেষে তাপমাত্রা বাড়তে পারে আজকের চেয়ে ৫ ডিগ্রি সে.।

এই সঙ্গে গত কিছুদিন ধরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করছেন। বায়ুমণ্ডলের উঁচু স্তরে সূর্যকিরণ পড়ার ফলে তিন-পরমাণুযুক্ত এক ধরনের অক্সিজেন অণু তৈরি হয় (সাধারণ অক্সিজেন অণুতে থাকে দু'টি করে পরমাণু)—একে বলা হয় ওজোন গ্যাস। পৃথিবীর বিশ থেকে ত্রিশ কিলোমিটার উঁচুতেই এই ওজোন গ্যাস থাকে সব চাইতে বেশি। এই গ্যাসের একটা গুণ হল এরা সূর্যের তীব্র অতিবেগুনি রশ্মিকে শুষে নিতে পারে। ওজোন স্তর এসব রশ্মি শুষে না নিলে পৃথিবীতে আমাদের গা ঝলসে যেত। এই স্তর সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি এবং পৃথিবী থেকে ছড়িয়ে পড়া তাপরশ্মি শুষে নিয়ে কিছুটা তেতে ওঠে।

সম্প্রতি নভোযান থেকে পাওয়া তথ্য পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, মানুষ ক্লোরো-ফ্লুরোকার্বন প্রভৃতি কিছু কিছু কৃত্রিম রাসায়নিক বস্তু ব্যবহারের ফলে তার প্রভাবে উঁচু বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাতে মানুষের চামড়া ঝলসে যাবার বা মানুষের চামড়ার ক্যানসার হবার আশঙ্কা বাড়ছে; সেই সঙ্গে উঁচু বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমছে। ওজোন স্তরের পরিমাণ যদি মাত্র এক শতাংশ কমে যায় তাতেই পৃথিবীতে অতিবেগুনি রশ্মিপাতের পরিমাণ বেড়ে যায় দু'শতাংশ। এই রশ্মির পরিমাণ ৫ শতাংশ বাড়লে অণুজীবদের জীবনচক্র অর্ধেক হয়ে যায়; যদি বাড়ে ১০ শতাংশ তাহলে গাছপালা আর সালোক সংশ্লেষণ চালাতে পারে না। সে রকম অবস্থা যদি কখনো ঘটে তাহলে পৃথিবীর প্রাণিকুলের জন্য এবং সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য এক মহাবিপদ ঘনিয়ে আসবে।

গত দু শ' বছরে নানা রকম গ্যাসের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কি ধরনের প্রভাব পড়েছে তার মোটামুটি ধারণা নিচের সারণি থেকে পাওয়া যাবে:

গত দুশ' বছরে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের প্রভাব

কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)	৬১%
মিথেন (CH_4)	২৩%
ক্লোরো-ফ্লুরোকার্বন (CFCs)	১২%
নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)	৪%
জলীয় বাষ্প, ওজোন এসব গ্যাসের প্রভাব সামান্য	

www.banglainternet.com

Goto List

জলবায়ুর পরিবর্তন আগেও ঘটেছে

পৃথিবী জুড়ে এই যে তাপমাত্রার বৃদ্ধি, বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটা ইতিহাসে এই যে প্রথম ঘটছে তা নয়। ঘটেছে আগেও বহুবার। পৃথিবীর জলবায়ু বদলেছে বারবার; তাই এটা এমন কিছু আশ্চর্যজনক বা অস্বাভাবিক কাণ্ড নয়। আবহবিদরা বলছেন, গত এক শ' কোটি বছরে পৃথিবীর ওপরে দেখা দিয়েছে অন্তত চারটি বেশ বড় রকম বরফের যুগ। এমনি এক একটি যুগে হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বিশাল এলাকা ঢাকা থেকেছে বিপুল পরিমাণ বরফের স্তূপে। আজ আমরা আছি এর মধ্যে শেষ বরফের যুগের একেবারে শেষ পর্যায়ে।

গত এক শ' কোটি বছরের মধ্যে বেশির ভাগ সময় পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা থেকেছে আজকের চেয়ে অনেক ওপরে—মোটামুটি ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। এসব সময়ে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলগুলোও থেকেছে বরফমুক্ত; অথচ আজ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা হল প্রায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর এখন আন্টার্কটিকা আর গ্রীনল্যান্ডে প্রায় দু'মাইল পুরু বরফের আস্তরণ বিছানো রয়েছে। এই এক শ' কোটি বছর জুড়ে যে জলবায়ু একই রকম ছিল তাও নয়: প্রায় পঁচিশ কোটি বছর পর পরই দেখা দিয়েছে দারুণ শীতের প্রকোপ। তখন পৃথিবীর বিশাল এলাকা ঢেকে গেছে বরফের পাঁজায়।

এমনি শেষ বরফের যুগ দেখা দিয়েছিল আজ থেকে প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে। তারপর থেকে প্রায় এক লক্ষ বছর পর পর আবার বরফ গলেছে; কিছুটা উষ্ণ জলবায়ু থেকেছে গড়পড়তা দশ হাজার বছর ধরে, তারপর আবার এসেছে প্রচণ্ড শীত। কাজেই গত দশ লাখ বছরে মানুষের মাথার ওপর দিয়ে গেছে অন্তত ন'টা প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ; এসব সময়ে ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার বেশির ভাগ জায়গা ঢাকা পড়েছে বিশাল বরফের স্তূপে। তবে এসব বরফের যুগ এসেছে বহু হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে; বরফ গলেছেও তেমনি বহু হাজার বছর ধরে। তাতে গাছপালা, জীবজন্তু জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে শিখেছে।

সবশেষের বরফের পাঁজা গলতে শুরু করেছিল আমাদের সময়ের ১৪,০০০ থেকে ১৮,০০০ বছর আগে। পৃথিবীর বেশির ভাগ জায়গা থেকে বরফের ঢাকা সরে যায় মোটামুটি দশ হাজার বছর আগে; আট হাজার বছর আগে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে উষ্ণ হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। তার ফলে মিসর, সুমেরিয়া, ভারত, চীন এসব দেশে দেখা দেয় মানুষের সভ্যতার বিকাশ। অবশ্য জলবায়ু উষ্ণ হয়ে ওঠার খেসারতও পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলকে দিতে হয়েছে। বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকা, আরব, সিন্ধু উপত্যকায় ২,০০০ থেকে ৩,০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত যে খরা আর শুকনো জলবায়ু দেখা দেয় তা এসব অঞ্চলে মরুভূমির মতো অবস্থা সৃষ্টি করে। তার পরও পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এমনি উষ্ণ আর শীতল জলবায়ুর আনাগোনা অব্যাহত থেকেছে; তাই কখনো দেশে দেশে দেখা দিয়েছে বৃষ্টিবাদলে ভেজা সময় আবার কখনো এসেছে খটখটে শুকনো সময়।

তবে আগেকার এসব আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে আজকের তাপমাত্রা বৃদ্ধির একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আগেকার পরিবর্তনগুলো ঘটেছে হাজার বা লক্ষ বছর সময় নিয়ে

www.banglainternet.com

Goto List

ধীরে ধীরে, অথচ আজ অনেকটা মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে এসব পরিবর্তন ঘটছে অনেক কম সময়ের মধ্যে। গত হাজার বছর ধরে মানুষ প্রকৃতিকে কেবলই জয় করতে আর ব্যবহার করতে চেয়েছে, প্রকৃতির নিজের স্বাস্থ্য আর স্বস্তির প্রয়োজনের কথা তেমন ভাবে নি আজ প্রকৃতি যেন তারই প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছে!

বহু লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে মানুষেব সংখ্যা ছিল কম, তাই প্রকৃতির ওপর মানুষের প্রভাবটা তেমন বড় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু গত কয়েক শতকে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে বিপুল হারে। মানুষ গোগ্রাসে শেষ করছে বনের গাছপালা, জমির সার পদার্থ, নদীর মাছ, ভূগর্ভের খনিজ, বাতাসের অক্সিজেন, পৃথিবীর প্রাণিসম্পদ। এর ফলে পরিবেশের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে প্রকৃতি তার ক্ষতি কিছুতেই পুষিয়ে নিতে পারছে না। প্রকৃতির ভারসাম্য আজ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

তাপমাত্রা সত্যি কি বাড়ছে?

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়লে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়বে এটা না হয় মেনে নেয়া গেল। কিন্তু সত্যি সত্যি যে তাপমাত্রা বাড়ছে, আর বাড়লেও ঠিক কি হারে বাড়ছে তা কি বিজ্ঞানীরা একেবারে নিশ্চিতভাবে জেনেছেন?

আসলে পৃথিবীব্যাপী গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ব্যাপারটি নিশ্চিততাবে এবং নিখুঁততাবে হিসেব করা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। আরো কঠিন হল এ ধরনের বৃদ্ধির সঠিক কারণটিকে চিহ্নিত করতে পারা জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আবহবিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠিত হয়েছে যার নাম IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)। প্রায় ২,৫০০ সদস্যবিশিষ্ট এই বিজ্ঞানীদল সারা পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানীদের দীর্ঘকালব্যাপী পর্যবেক্ষণকে সমন্বিত করে আজ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সত্যি সত্যি তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ নিয়ে। একদল বিজ্ঞানী বলছেন গত দুশ' বছরে যত জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো হয়েছে আর তাতে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ঘটেছে তাতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা আরো বেশি বাড়া উচিত ছিল।

আরেক দল বিজ্ঞানী অবশ্য এ রহস্যের একটা সমাধানও দিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে শুধু তো কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ঘটছে না, সেই সঙ্গে সালফার ডাই-অক্সাইড বা সালফেট-এরও নিঃসরণ ঘটছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড যেমন আলাকরশ্মিকে ঢুকতে দেয় আর তাপরশ্মিকে পৃথিবী ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধা দেয়, সালফেটের বেলায় ঘটে অনেকটা এর উল্টো ব্যাপার। বাতাসে ভাসমান সালফেট কণা সূর্যের আলোকরশ্মিকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ঢুকতে বাধা দেয়; কাজেই তার প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বরং কমে যায়।

এর সপক্ষে তাঁরা ১৯৯১ সালে ফিলিপাইনের মাউন্ট পিনাটুবো আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। এই আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ এমন বিপুল পরিমাণ ধূলিকণা আর সালফেট অতি

www.banglainternet.com

Goto List

উঁচু আকাশে ছুঁড়ে দেয় যে, সে সব মাটিতে এসে পড়তে দু'বছর লেগে যায়। IPCC-এর বিজ্ঞানীরা বললেন, এর ফলে ঐ এলাকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি সাময়িকভাবে হলেও কিছুটা প্রতিহত হবে; আর সত্যি সত্যি তা ঘটলও। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে এই আগ্নেয়গিরি প্রায় দু'কোটি টন সালফার ডাই-অক্সাইড আকাশে উগরে দেয়। প্রতি বছর মানুষ বায়ুমণ্ডলে তার চেয়ে প্রায় আট গুণ সালফার ডাই-অক্সাইড ছুঁড়ে দিচ্ছে, তবে আগ্নেয়গিরির মতো অত উঁচুতে নয়। তবু বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে তার প্রভাব তো একটা আছেই।

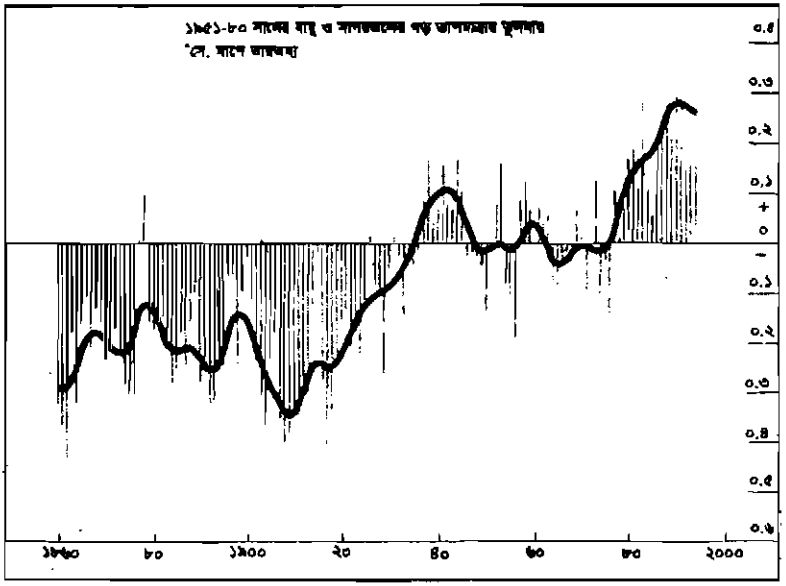

অতীতে যেমন ঘটেছে: ১৯৫১–৮০ সালের বায়ু ও সাগর তলের গড় তাপমাত্রার তুলনায় °সে. মাপে তারতম্য

বায়ুমণ্ডলে বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড আর বেশি সালফার ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ঘটলে (যেমন এখন ঘটছে) তার ফলে কি পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি হতে পারে তার কম্পিউটার মডেল তৈরি করে অতীত ও বর্তমানের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে মডেলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের খুবই মিল রয়েছে। আবার আর কিছু বিজ্ঞানী প্রথমে শুধু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ হচ্ছে ধরে মডেলটি চালালেন, তারপর আবার চালালেন কার্বন ডাই-অক্সাইড আর সালফার ডাই-অক্সাইডের মিলিত নিঃসরণ ধরে। দেখা গেল শুধু কার্বন ডাই-

www.banglainternet.com

Goto List

অক্সাইড নিঃসরণ হলে যে পরিমাণ তাপমাত্রা বাড়ে তার চেয়ে দু'ধরনের নিঃসরণ মিলিত হলে তাপমাত্রা কিছুটা কম বাড়ে। পর্যবেক্ষণের তথ্যের সঙ্গে এরই মিল বেশি। এমন কি উঁচু বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমেও যেতে পারে। আর এই মিলিত ফলে প্রতি দশকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়ে প্রায় ০.২০ সেলসিয়াস (অর্থাৎ এক শতাব্দীতে দু' ডিগ্রি)।

বাংলাদেশে কী ঘটতে পারে

ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়া আর উঁচু বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমা—এই দু'ধরনের পরিবর্তনের ছাপ এর মধ্যেই পৃথিবীর জলবায়ুতে পড়তে শুরু করেছে । তবে এই ছাপ যে পৃথিবীর সব জায়গায় একইভাবে পড়ছে তা নয়। সাধারণভাবে চারপাশের তাপমাত্রা বাড়লে জলীয় বাষ্প সৃষ্টি হয় বেশি, তাতে বৃষ্টিপাত বাড়ে। তবে এ ধরনের পরিবর্তন গ্রীষ্মমণ্ডলে যতটা ঘটবে নাতিশীতোষ্ণ বা হিমমণ্ডলে ঘটতে পারে তার চাইতে তিন গুণ বেশি। আবার শীতপ্রধান এলাকাগুলো বেশি উষ্ণ হয়ে ওঠার ফলে পৃথিবীর সাধারণ বায়ু প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। বায়ু প্রবাহ কমলে বৃষ্টিপ্রবণ এলাকায় ক্রমাগত বৃষ্টি হতেই থাকবে, আবার হয়তো খরাপ্রবণ এলাকায় আরো তীব্র খরা দেখা দেবে অর্থাৎ সব কিছু মিলিয়ে পৃথিবীর বেশির ভাগ এলাকায় আগামী শতাব্দীতে আবহাওয়ায় বিরাট রকম বিপর্যয় ঘটতে শুরু করবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এসব পরিবর্তনের কিছু কিছু নমুনা এর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

পৃথিবীর তাপমাত্রা, বিশেষ করে হিমমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে ওঠার আরো একটা গুরুতর ফল হবে। মেরু অঞ্চলের ও হিমবাহের বরফ গলতে শুরু করবে; তাছাড়া উষ্ণতা বাড়লে সাগর জলের আয়তনও বেশি হবে। আর তাতে পৃথিবী জুড়ে সাগরের উচ্চতা বাড়বে। এর ফলে সমুদ্রতীরের অনেক নিচু অঞ্চল তলিয়ে যাবে। তখন চাষের জমিতে সমুদ্রের লোনা পানি এসে ঢাকার ফলে দেশের বিরাট এলাকায় চাষবাস নষ্ট হবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন, আগামী শতাব্দীতে পৃথিবীর উষ্ণতা আজকের তুলনায় গড়ে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো বেশি হলে সাগর জলের আয়তন যেটুকু বাড়বে শুধু তাতেই সাগরের উচ্চতা বেড়ে উঠতে পারে এক মিটারের মতো। এতে বাংলাদেশের মতো বদ্বীপ অঞ্চলের দেশে সমুদ্রতীরের বিশাল এলাকা তলিয়ে যাবার ফলে গৃহহারা হবে অন্তত এক কোটি লোক, মিসরেও ঘটবে এমনি। একুশ শতকের শেষে সাগরতলের উচ্চতা বাড়তে পারে তিন মিটার; তাহলে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকা তলিয়ে যাবে আর উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে প্রায় অর্ধেক লোক।

পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের বাস সমুদ্রতীর থেকে মাত্র ষাট কিলোমিটারের মধ্যে। কাজেই সমুদ্র যদি ফেঁপে উঠে ডাঙ্গার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে তাহলে অসংখ্য নগর-জনপদে নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হবে। অবশ্য পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়লে অনেক শহর এলাকায় গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েই তেষ্টানো দায় হয়ে উঠবে। সেই সঙ্গে আবার উত্তরের অনেক অতিশীতল এলাকা চাষবাসের ও মানুষ বাসের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে।

www.banglainternet.com

Goto List

শুধু যে উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত আর খরাই কৃষিতে প্রভাব বিস্তার করবে তা নয়, কার্বন ডাই-অক্সাইড গাছপালার বৃদ্ধির জন্য একান্ত জরুরি। কাজেই হাওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়লে ফসলের ফলন বাড়তে পারে। অবশ্য সেই সঙ্গে আগাছারও বাড়-বাড়ন্ত হবে। তাতে মাটিতে নাইট্রোজেনের ঘাটতি হয়ে ফসলের খেতে রোগ-বালাই বাড়তে পারে; কীটপতঙ্গের আক্রমণ ঠেকানোও হয়তো ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠবে।

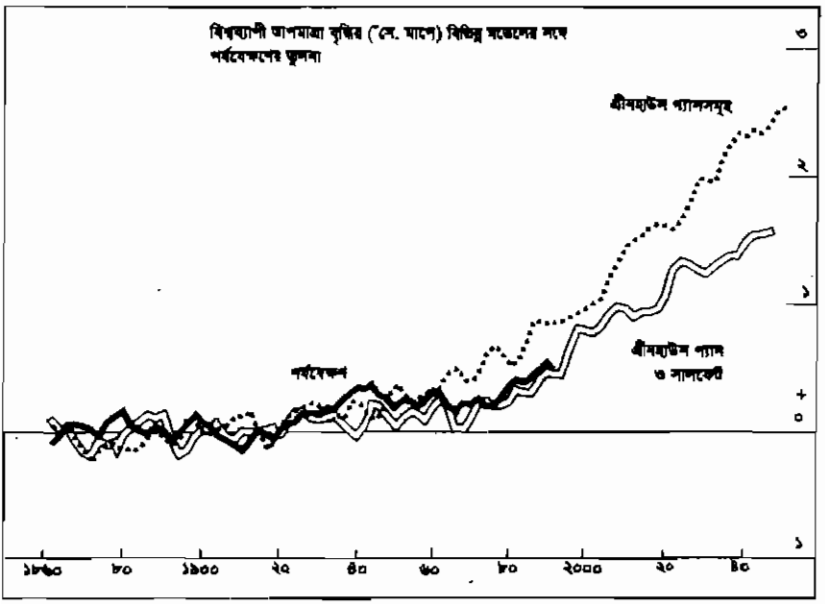

ভবিষ্যতে যেমন ঘটতে পারে: বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির। (সে. মাপে) বিভিন্ন মডেলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের তুলনা

কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ঠিক কতখানি বাড়ছে, ওজোনের পরিমাণ কতখানি কমছে, পৃথিবীর উষ্ণতার মাপ কতখানি উঠছে?—এসব নিয়ে সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞানীরা আজ নানা মাপজোখ নিচ্ছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এসবের কারণ কি, কীই বা হতে পারে ফলাফল, ক্ষতিকর ফলাফল কি করে ঠেকানো যায়—সেসব বোঝার চেষ্টা করছেন। আর তাঁদের এসব চেষ্টা থেকে আগামী দিনের পৃথিবীর ছবি আমাদের কাছে ক্রমেই বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

তবে একটা বিষয় আজ বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সে হল বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিল্পায়ন হয়েছে খুব কম; তারা জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে

www.banglainternet.com

Goto List

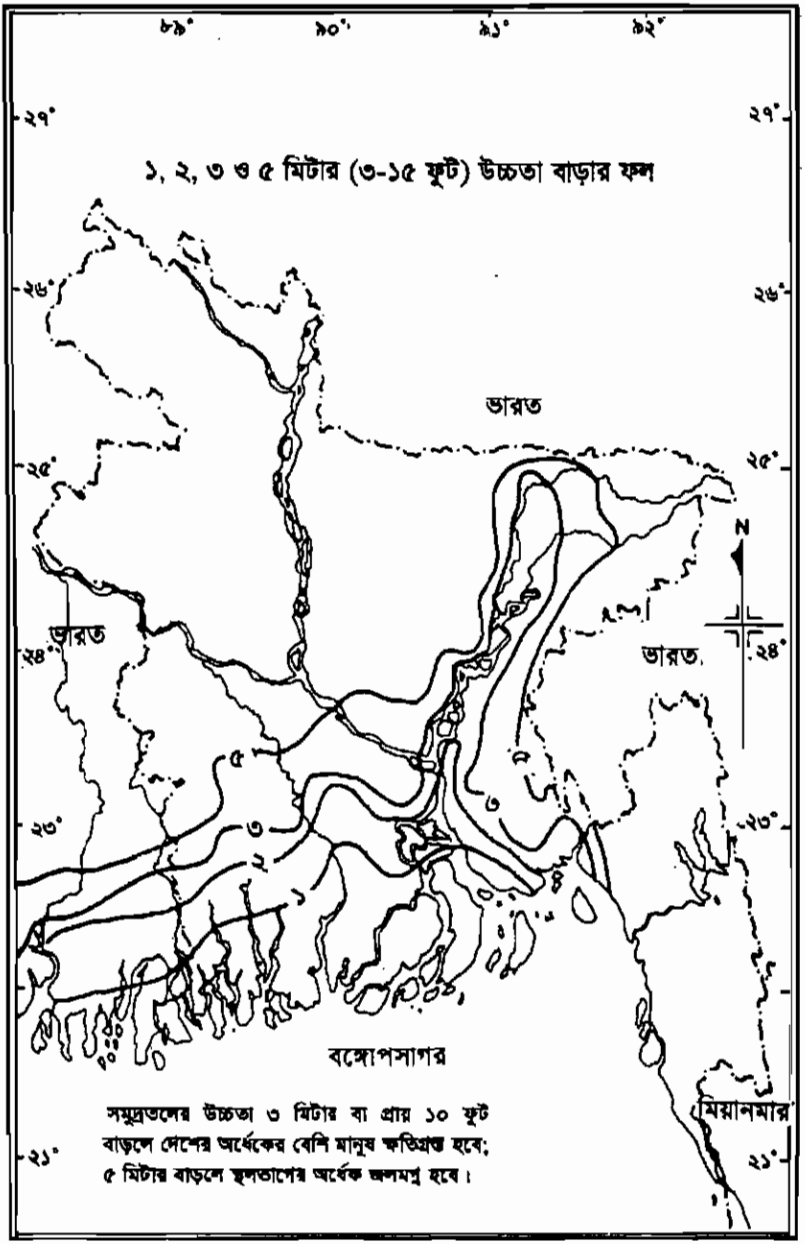

সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়লে বাংলাদেশের কোথায় কোথায় এলাকা জলমগ্ন হবে

Goto List

সামান্য, আর তাই কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপাদনও করে শিল্পোন্নত দেশগুলোর চেয়ে অনেক কম। এসব দেশে ক্লোরো-ফ্লুরোকার্বনজাতীয় ক্ষতিকর গ্যাসের ব্যবহারও সামান্যই। কাজেই আজকে আবহাওয়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত যে পরিবেশগত বিপদ সারা পৃথিবীর সামনে বিশাল হুমকি সৃষ্টি করেছে তার সমাধান রয়েছে প্রধানত শিল্পোন্নত দেশগুলোর হাতে। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নানারকম গ্যাসের নিঃসরণ কমিয়ে আনার জন্য আজ তাদেরই সবার আগে উদ্যোগ নিতে হবে।

কিন্তু তা বলে বাংলাদেশে আমরা হাত পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাদের দেশে আবহবিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান এসব বিষয়ে চর্চা ও গবেষণা জোরদার করা দরকার; সারা দেশে, বিশেষত উপকূল অঞ্চলে উন্নত তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু করা দরকার; উপকূলে ম্যানগ্রোভ বনায়ন প্রভৃতি গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার প্রতিষেধক ব্যবস্থাদি নেবার কথা এখন থেকেই ভাবতে হবে।

www.banglainternet.com

Goto List

দুনিয়া জুড়ে 'এত্তা জঞ্জাল'...

দুনিয়া জুড়ে আজ যে পরিবেশ সমস্যা তার একটা প্রধান দিক হল আবর্জনার স্তূপ। বিপুল আবর্জনার স্তূপ জমে উঠছে শহরে-বন্দরে নদীতে-সমুদ্রে, আমাদের ঘরবাড়ির আশেপাশে —সর্বত্র। দেশে দেশে মানুষ বাড়ছে আর তারা নির্বিচারে চারপাশে ছড়িয়ে চলেছে তাদের জীবন চর্চার নানা বর্জ্য পদার্থ। যত ঘটছে উন্নয়ন তত যেন মানুষ সেই উন্নয়নের নাম করে তার চারপাশে ছিটিয়ে যাচ্ছে বিষ; প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘটিয়ে চলেছে তাণ্ডব। কল-কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া আচ্ছন্ন করছে নগর-জনপদের আকাশ-বাতাস; রাসায়নিক কারখানার বর্জ্যদ্রব্য সব নদী আর হ্রদের পানিকে করছে দূষিত; সেই বিষাক্ত পরিবেশে বিনষ্ট হচ্ছে জমির উর্বরতা, দূষিত হচ্ছে পানীয় জলের সরবরাহ, ধ্বংস হচ্ছে বন-বনানী, স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে পাখির কলকাকলি।

পরিবেশের অনেক সমস্যা দুর্নিরীক্ষ্য বলে সহজে সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে না। কিন্তু আবার কখনো অস্পষ্ট বা অতি দূর কোনো সমস্যা আকস্মিক প্রচণ্ড নাটকীয়তা নিয়ে মানুষের অতি কাছে চলে আসে। ভূপালে কীটনাশক কারখানায় বিষাক্ত গ্যাস নিঃসরণে যখন প্রায় তিন হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে তখন সে খবর আর শুধু ভারতের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে। তেমনি সোভিয়েত ইউক্রেনের চরনোবিল নামে এক অখ্যাত জনপদে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটে যখন তেজস্ক্রিয় ভস্ম চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে তখন সে আতঙ্ক পৃথিবীর আরেক প্রান্তে বাংলাদেশের মানুষকেও এমনভাবে গ্রাস করে যে, তারপর এদেশের বহু লোক দীর্ঘকাল দুধ বা দুগ্ধজাত কোন জিনিস খাওয়া বর্জন করে। ভণ্ড ধর্মগুরু আশাহারার দল যখন জাপানের পাতালরেলে বিষবাষ্প ছেড়ে দেয় বা আফ্রিকায় সাহেল অঞ্চলের দেশগুলোতে যখন দীর্ঘকালীন খরা দেখা দেয় তখন তার প্রবল ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীর বহু দূর প্রান্তে; পৃথিবীর নানা অঞ্চলে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে মানুষ।

www.banglainternet.com

Goto List

সেই সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে জঞ্জালের স্তূপ নিত্য জমে উঠতে থাকে তা তো আর কাউকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না। রোজকার কাগজ খুললেই চোখে পড়ে এমনি ধারার অজস্র খবর: দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ স্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধে থেকে বঞ্চিত; কৃষি খাতে রাসায়নিক সার আর কীটনাশক ব্যবহারের কারণে সারা দেশে নদীতে পুকুরে দেখা দিয়েছে মাছের মড়ক; ঢাকার হাজারিবাগ এলাকার ১৭০টি ট্যানারি থেকে প্রতিদিন গড়ে ২,৫০০ গ্যালন পুতিগন্ধময় তরল বর্জ্য বুড়িগঙ্গায় পড়ে তার পানিকে করে তুলছে দূষিত; চট্টগ্রাম বন্দরে প্রতি বছর অন্তত ছ'হাজার মেট্রিক টন তেল চুইয়ে পড়ছে —তাতে কমে যাচ্ছে মাছ, বেকার হয়ে পড়ছে হাজার হাজার জেলে; উত্তরে গঙ্গার প্রবাহ কমে যাওয়ায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নদীর পানি অতিরিক্ত রকম লোনা হয়ে উঠছে, তাতে খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

সম্প্রতি এক জরিপ থেকে জানা যায় বাংলাদেশে শতকরা ৮০ ভাগ রোগ হয় দূষিত পানি থেকে। আর যদিও সাম্প্রতিক কালে ইউনিসেফের সহযোগিতায় দেশের প্রায় তিনভাগের একভাগ বাড়িতে আজ স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার বসানো হয়েছে, তবু এখনও শতকরা নব্বই ভাগ শিশু মল-মূত্র ত্যাগ করে খোলা জায়গায়। স্বভাবতই তার ফলে জলদূষণ এখনও দেশে খুব ব্যাপক, বিশেষ করে বর্ষার শেষে ডায়রিয়া প্রভৃতি পানিবাহিত রোগে প্রতি বছর বহু মানুষ প্রাণ হারায়।

কিছুদিন আগে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে পৃথিবীর চৌদ্দটি দেশের কতকগুলি শহরের বাতাস পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাতে দেখা যায় কলকাতার মতো এমন দূষিত বাতাস আর কোনো শহরের নয়। কলকাতার মানুষ গড়পড়তা দৈনিক যে এক কেজি পানি আর ১৪ কেজি হাওয়া খান তার সঙ্গে তাঁরা আরো পেয়ে যান প্রচুর পরিমাণে সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, এমন কি অনেকখানি সীসা, নিকেল আর অ্যাসবেস্টস। তাছাড়া দেখা যায় গঙ্গার 'পবিত্র' জলে যে পরিমাণ দূষণ এমন পৃথিবীর আর খুব কম নদীতে আছে। ঢাকা শহরে ঠিক এ ধরনের সমীক্ষা এখনও হয় নি; হলে নিশ্চয়ই দেখা যেত ঢাকার দূষণ পরিস্থিতি কলকাতার চেয়ে কোন অংশে ভাল নয়। ঢাকা নগরীর লোকসংখ্যা আজ কলকাতাকে ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম করছে। পেট্রল-ডিজেলচালিত যানবাহনের সংখ্যাও কলকাতার চেয়ে ঢাকায় কম হবে বলে মনে হয় না। কলকাতার গঙ্গার পানি তবু এর মধ্যে শোধনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে; ঢাকার বুড়িগঙ্গা বা শীতলক্ষ্যায় শোধনের উদ্যোগ এখনও শুরু হয় নি।

আসলে সব কিছু মিলিয়ে পরিবেশের দূষণের সমস্যা আজ যেমন বাংলাদেশে তেমনি সারা পৃথিবী জুড়ে। মানুষের পরিবেশ আজ যে সর্বগ্রাসী বিপদের সম্মুখীন এ চেতনা আজ আর শুধু বিজ্ঞানীদের বা পরিবেশবাদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। ষাটের দশকে যাকে মনে হচ্ছিল কেবল উন্নত দেশের গুটিকতক মানুষের সমস্যা, তা এই আশির দশকের শেষে হয়ে দাঁড়িয়েছে সারা পৃথিবীর মানুষের সমস্যা।

www.banglainternet.com

Goto List

পরিবেশের দূষণ

এখানে অবশ্য একটা কথা উঠবে—আমরা আবর্জনা, জঞ্জাল বা দূষণ বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছি। আমাদের চারপাশে নানা ধরনের জিনিস আছে; তার মধ্যে কিছু আমাদের জন্য যেমন অতি প্রয়োজনীয় তেমনি আর কিছু আছে যেগুলো আমাদের জন্য রীতিমতো ক্ষতিকর। সেগুলোকে আমরা বর্জন করতে চাই; তাই তাদের বলি বর্জ্য পদার্থ। এমনি বর্জ্যবস্তু অল্পস্বল্প পরিবেশে থাকলেও আমরা তাতে অভ্যস্ত বলে সেগুলো আমাদের তেমন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু এসব জিনিসের পরিমাণ যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তাহলে আমাদের দেহের ওপর তাদের ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে। সে অবস্থাকেই আমরা বলি পরিবেশ দূষণ।

পরিবেশ দূষণ নানাভাবে ঘটতে পারে। তার মধ্যে প্রধান হল আমাদের জীবন ধারণের অতি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর মধ্যে মানুষের দেহের জন্য ক্ষতিকর জিনিসের পরিমাণ বেড়ে ওঠা। যেমন আমাদের সুস্থ জীবনের জন্য চাই বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ পানি, দূষণমুক্ত মাটি, দূষণহীন পুষ্টিদায়ক খাবার-দাবার, স্বাস্থ্যকর আবাস। এ সবই নানা কারণে দূষণযুক্ত হতে পারে—যেমন রাসায়নিক দূষণ ও জীবাণুঘটিত দূষণ। অনেক সময় স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব জিনিস তেমন ক্ষতিকর নয় সেগুলোও মাত্রাতিরিক্ত হলে অপকারী ও দূষণের কারণ হয়ে উঠতে পারে। যেমন স্বাভাবিক শব্দ ক্ষতিকর নয়, কিন্তু উচ্চগ্রামের শব্দ—বিশেষ করে অসুস্থ লোকের জন্য-রীতিমতো ক্ষতিকর হতে পারে। তেমনি যথাযথ ওষুধ মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে; কিন্তু সেই ওষুধই আবার ঠিকমতো প্রয়োগ করা না হলে রোগীর জীবন সংশয় ঘটতে পারে।

আমরা মোটামুটি বুঝি যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ স্বাস্থ্যকর; আবার আবর্জনাপূর্ণ অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কাজেই চারপাশে যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেললে সে পরিবেশ দূষিত হয়ে উঠবে। এই দূষণ যেমন চারপাশের বাতাসে ঘটতে পারে তেমনি নদী-নালা-পুকুরের পানিতেও ঘটতে পারে। এককালে পৃথিবীতে মানুষ যখন কম ছিল তখন পরিবেশের বর্জ্য বস্তুর সমস্যা আজকের মতো এমন প্রকট হয়ে ওঠে নি। অনেক ক্ষেত্রে বিরল জনবসতির এলাকায় প্রকৃতির রোদ-হাওয়া, অণুজীব, পোকামাকড়, পাখিরা পরিবেশের শোধনের কাজটি করে দিয়েছে। কিন্তু আজ শুধু যে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে তা নয়, সে মানুষ বাস করছে আগের চাইতে অনেক বেশি ঘনসংবদ্ধ হয়ে। তার ফলে প্রাকৃতিক শোধন আর সে সব বর্জ্যবস্তুকে নিরাপদ বস্তুতে পরিণত করতে পারছে না। অনেক সময় সে সব আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে মানুষের জন্য মারাত্মক বিপদ সৃষ্টি করছে। তার ওপর মানুষ আবার বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ব্যবহার করে নানা নতুন ধরনের ভোগ্যবস্তুর উদ্ভাবন ঘটিয়েছে; তার ফলে বর্জ্য বস্তুর পরিমাণ ও তার নিষ্কাশনের জটিলতা দুইই বেড়েছে।

www.banglainternet.com

Goto List

কৃষিক্ষেত্রে দূষণ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা যেমন বেড়ে চলেছে তেমনি এই বাড়তি জনসংখ্যার জন্য খাবার যোগাড়ের সমস্যাও দেখা দিয়েছে। ষাটের দশকে আসে উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল; তার চাষের জন্য দরকার হয় প্রচুর পরিমাণ সার ও কীটনাশক। মাত্র গত এক যুগে দেশে সারের ব্যবহার প্রায় তিন গুণ হয়েছে। ১৯৮০-৮১ সালে যেখানে মোট রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয় প্রায় ৯ লক্ষ মেট্রিক টন সেখানে ১৯৯২-৯৩ সালে ব্যবহৃত হয় ২৬ লক্ষ মেট্রিক টনের ওপরে। এসব রাসায়নিক সার অনেক ক্ষেত্রে যথাসময়ে এবং উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় না বলে তা থেকে যথাযথ ফল পাওয়া যায় না। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বৃষ্টি বা সেচের পানিতে ধুয়ে এসব সার গিয়ে পড়ে খাল-বিল নদী-নালায়; তাতে পানি দূষিত হয় এবং মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর হয়।

ঠিক তেমনিভাবে দেশে কীটনাশকের ব্যবহারও দ্রুত বাড়ছে। গত এক যুগে এর ব্যবহার প্রায় তিন গুণ হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে দেশে কীটনাশকের ব্যবহার হয় তিন হাজার মেট্রিক টন, সেটা ১৯৯০-৯১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় সাত হাজার টন; ১৯৯৫-৯৬ সালে ব্যবহার পনের হাজার টন ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। কতকগুলো কীটনাশক মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে উন্নত বিশ্বে সেগুলোকে এর মধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে; এই সংখ্যা ইতোমধ্যে ১৮টিতে পৌঁছেছে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল: এনড্রিন, ডি.ডি.টি., বি.এইচ.সি., প্যারাথিয়ন, হেপ্টাক্লোর, ক্লোরডেন, ডায়েলড্রিন, প্যারাকুয়াট, ২,৪-ডি, মেথক্সি-ইথাইল মার্কারি ক্লোরাইড, অ্যালড্রিন, ক্যাম্ফেক্লোর, লিণ্ডেন, ইত্যাদি। কিন্তু বাংলাদেশে এর প্রথম চারটি মাত্র কৃষিক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সে নিষেধাজ্ঞাও যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে না। এই চারটি ছাড়া অন্যান্য ক্ষতিকর কীটনাশক কৃষিক্ষেত্রে এবং অন্যান্য কাজে নির্বিচারে ব্যবহার করা হচ্ছে।

দীর্ঘকালের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ডি.ডি.টি.-র মারাত্মক স্বাস্থ্যগত প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত হওয়ায় বাংলাদেশে ১৯৯১ সাল থেকে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু পত্র-পত্রিকার খবর অনুযায়ী দেশে নানা কাজে এখনও তার ব্যবহার অব্যাহত আছে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে মাছ শুঁটকি করার পর তাতে যেন পোকা না লাগে সেজন্য দেদার নগস, বাসুডিন প্রভৃতি ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে। এদেশে সাধারণত কীটনাশকের বিক্রেতা ও ব্যবহারকারীরা সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে সচেতন নয়, তার ফলে অসতর্ক ব্যবহারের কারণে অনেকের দেহে বিষক্রিয়া দেখা দেয় এবং দীর্ঘকালীন ব্যবহারে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হয়। এ ধরনের ক্ষতি যে কেবল মানুষের হচ্ছে তা নয়, পরিবেশে মানুষের বন্ধু যে সব পোকামাকড় ও অণুজীব রয়েছে তাদেরও অনেক প্রজাতি এর ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

www.banglainternet.com

Goto List

মাটিতে এবং অন্যত্র যে সব অণুজীব বাস করে তাদের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশের মতো মানুষের জন্য ক্ষতিকর, বাকি ৯৫ শতাংশই মানুষের বন্ধু এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তেমনি আমাদের চারপাশে যেসব পোকামাকড়, সরীসৃপ, পাখি ইত্যাদি রয়েছে তাদেরও অধিকাংশই উপকারী। অথচ পরীক্ষা থেকে দেখা যায়

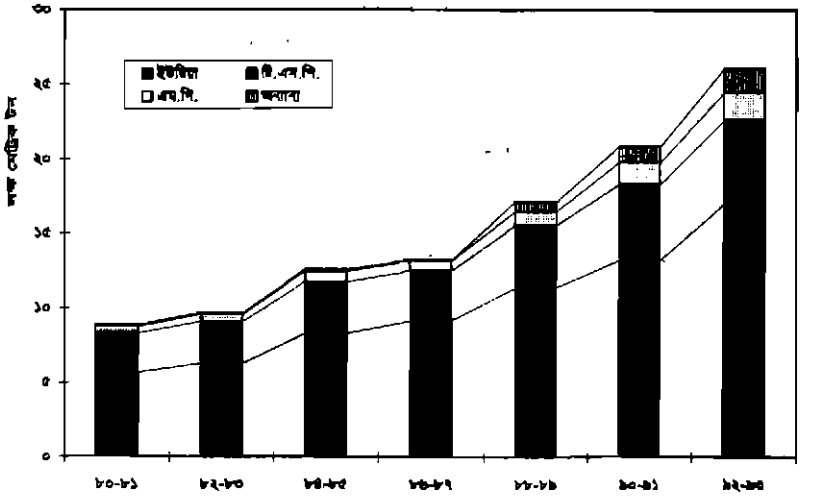

বাংলাদেশে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়ছে

কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মানুষের জন্য ক্ষতিকর অণুজীব, পোকামাকড় বা অন্যান্য জীবের যতটা ক্ষতি হয় তার চেয়ে শেষ পর্যন্ত উপকারী অণুজীব, পোকামাকড় এদের ক্ষতি বেশি হয়। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ক্ষতির কারণে আজ উন্নত দেশগুলোতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সমন্বিত বালাই দমন ও পরিবেশসম্মত কৃষিব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে এদিকে এখনও তেমন অগ্রগতি ঘটছে বলে মনে হয় না। এ ধরনের কৃষির জন্য যে শিক্ষিত ও সচেতন কৃষকের প্রয়োজন, যা বাংলাদেশে আজও সুদূরপরাহত মনে হয়। অথচ এদিকে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে জমির গুণাগুণ যেভাবে নষ্ট হচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে মারাত্মক কৃষি বিপর্যয় দেখা দেয়া বিচিত্র নয়।

www.banglainternet.com

Goto List

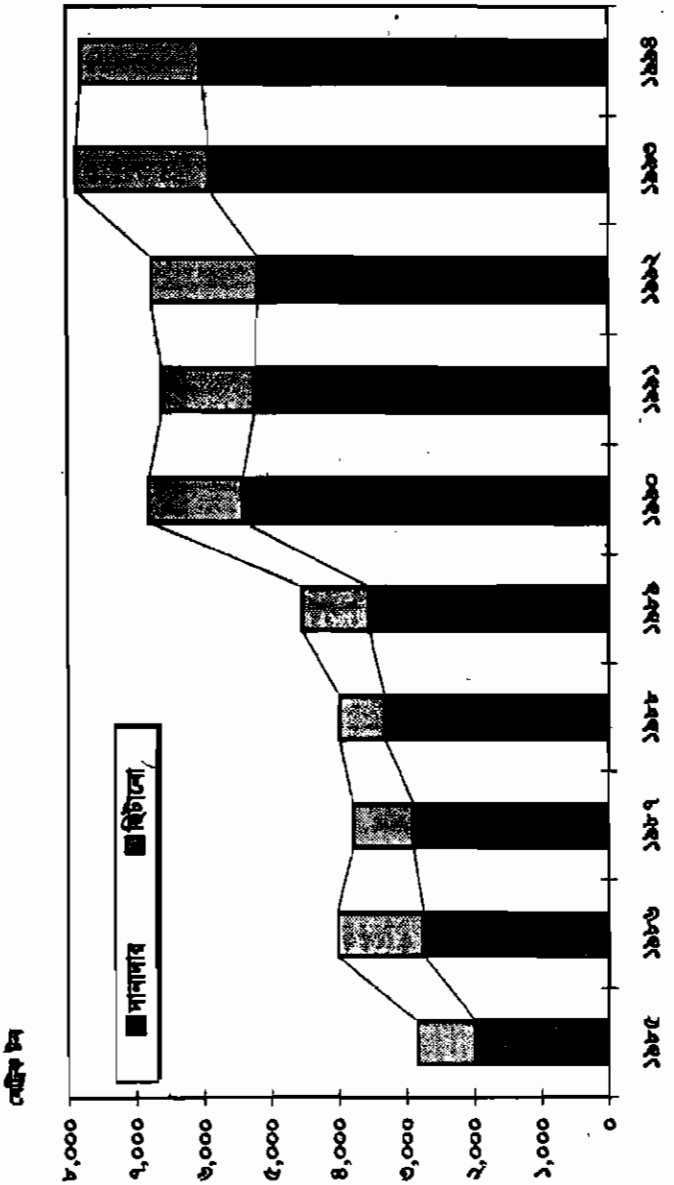

বাংলাদেশে কীটনাশকের ব্যবহার

www.banglainternet.com

Goto List

দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্রমেই শিল্পায়নের দিকে দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে। তার ফলে আজ দেশের মোট জাতীয় আয়ে কৃষিক্ষেত্রের অংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩০ শতাংশের কাছাকাছি, আর শিল্পক্ষেত্রের অংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ শতাংশের মতো। কিন্তু শিল্প স্থাপনের সময় চারপাশের পরিবেশের ওপর তার কি ধরনের প্রভাব পড়বে তা প্রায়শ তেমন খতিয়ে দেখা হচ্ছে না। তার ফলে রাসায়নিক শিল্পগুলো পরিবেশ দূষণের বড় রকম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশে আজ ৪০,০০০-এর ওপর শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে; তার মধ্যে অবশ্য মাত্র হাজার খানেক প্রতিষ্ঠান মাঝারি ও বড় আকারের। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে পাটকল, সুতা ও বস্ত্রকল, মণ্ড ও কাগজ কল, চিনি কল, সিমেন্ট কারখানা, রাসায়নিক সার, ট্যানারি (চামড়া), ওষুধ, রিফাইনারি ইত্যাদি। এই কারখানাগুলোর অধিকাংশই বসানো হয়েছে নদীর ধারে এবং এদের বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ কোন রকম প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই ফেলা হচ্ছে নদীর পানিতে।

রাসায়নিক কারখানার বর্জ্য দ্রব্য প্রায়শ পানির অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়; তার ফলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীরা শ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন না পেয়ে মারা পড়তে থাকে। অনেক সময় পানিতে প্রচুর পরিমাণে এমন সব আগাছা জন্মাতে শুরু করে যে, তাতেও পানির অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। আবার এসব দূষিত তরল বর্জ্য নিঃসরণের মধ্যে যে সব বিষাক্ত ধাতব যৌগ থাকে সেগুলো পানির খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে ঘনীভূত হয় এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের দেহে আশ্রয় করে মারাত্মক স্বাস্থ্যগত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ঢাকার কাছে বুড়িগঙ্গা নদীতে এবং চট্টগ্রামের কাছে কর্ণফুলি নদীতে প্রতিদিন যে পরিমাণ দূষিত বর্জ্য বস্তু পড়ছে তা যথাক্রমে তিন শ' টন ও দু' শ টনের কম হবে না। ঘোড়াশাল ও নরসিংদির কাছে শীতলক্ষ্যা নদী, খুলনার কাছে ভৈরব, টঙ্গির কাছে বালু, সাতকের কাছে সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জের কাছে কুশিয়ারা এসব নদীর স্বাস্থ্যও আজ দূষণের কারণে শোচনীয়।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো যে কেবল পানিতেই দূষণ ঘটাচ্ছে তা নয়, কয়লা, তেল প্রভৃতি জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে দূষিত করে তুলছে আমাদের চারপাশের বাতাসকে। পেট্রল-ডিজেলচালিত যানবাহনও তেমনি বিষিয়ে তুলছে বায়ুমণ্ডলকে। অবশ্য শিল্পোন্নত দেশগুলো আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে পৃথিবীর বায়ু দূষণের জন্য অনেক বেশি পরিমাণে দায়ী।

দুনিয়া জুড়ে দূষণ

দূষণ যে কেবল বাংলাদেশে ঘটছে তা নয়, ঘটছে সারা দুনিয়া জুড়েই। ভূমধ্যসাগর হল ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সারা ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা আর পশ্চিম এশিয়ার বিনোদনের কেন্দ্র। মনোরম আবহাওয়া আর টলটলে পানি এই সাগরের চারপাশ ঘিরে অসংখ্য সমুদ্র সৈকতে টেনে আনে লক্ষ লক্ষ শ্রান্ত মানুষকে স্বাস্থ্য উদ্ধার আর অবসর বিনোদনের জন্য। সারা দুনিয়ার

www.banglainternet.com

Goto List

চিত্রতারকা, রাজন্য আর অভিজাতদের অতি প্রিয় সমুদ্র সৈকত ক্যান, কাপ্রি আর লিডো এই এলাকাতেই। কিন্তু সেই ভূমধ্যসাগরের আজ দুর্দিন যাচ্ছে। গত বছর আদ্রিয়াতিক সাগরে ভাসছিল প্রায় পাঁচ কোটি টন বিজল বিজল ফেনা, মরক্কো থেকে গ্রীস পর্যন্ত সাগরের তীরে ভেসে উঠেছিল হাজারখানেক মরা ডলফিন (শুশুক)। আসলে ভূমধ্যসাগরের প্রায় ৪৬,০০০ কিলোমিটার উপকূল জুড়ে যে প্রায় তের কোটি লোকের বাস তাদের শিল্পায়ন আর উন্নয়নের ধাক্কায় নাভিশ্বাস উঠছে ভূমধ্যসাগরের।

ভূমধ্যসাগরের তীরের এই তের কোটি স্থায়ী বাসিন্দার সঙ্গে যোগ হয় আরো প্রায় দশ কোটি অস্থায়ী বাসিন্দা, যারা প্রতি বছর বিনোদনের জন্য এখানে বেড়াতে আসে নানা দেশ থেকে। এতগুলো মানুষের প্রায় আশি শতাংশ পয়ঃনিষ্কাশন—বছরে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টনের মতো—কোনো রকম প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই সরাসরি এসে পড়ে সাগরে। এই পয়ঃনিষ্কাশনই সব নয়। জাতিসঙ্ঘ পরিবেশ কর্মসূচির হিসেব অনুযায়ী মানুষী কর্মকাণ্ডের ফলে প্রতি বছর ভূমধ্যসাগরের পানিতে এসে পড়ছে ১,২০,০০০ টন খনিজ তেল, ৬০,০০০ টন কৃত্রিম সাবান, ১০০ টন পারদ, ৩,৮০০ টন সীসা আর ৩,৬০০ টন ফসফেট। এসব বর্জ্যের তিন-চতুর্থাংশ আসে ফ্রান্স, ইতালি আর স্পেন থেকে। এছাড়া প্রতি বছর জাহাজ থেকে সমুদ্রের পানিতে ফেলা হচ্ছে প্রায় পনের লক্ষ টন ঝড়তি পড়তি অপরিশোধিত তেল; প্লাস্টিকজাতীয় বর্জ্য যেগুলো পরিবেশে জীর্ণ হতে লেগে যায় বহু শত বছর সেগুলোও সমুদ্রে জমে উঠছে বিপুল পরিমাণে।

ভূমধ্যসাগরের একটি উপাদেয় খাবার হল ঝিনুক; কিন্তু পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এই ঝিনুকের মধ্যে পাচ্ছেন বিপজ্জনক মাত্রায় পারদ বিষ। এগুলো মানুষে খাওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে; কিন্তু সে নিষেধ খুব কম লোকেই মানছে। ভূমধ্যসাগরের ৫০০ প্রজাতির মাছের মধ্যে আজ খাবার জন্য ধরা হচ্ছে প্রায় ১০০ প্রজাতি। প্রতি বছর জেলেরা বিশাল সব জাল দিয়ে মাছ ধরছে প্রায় ২০ লক্ষ টন; কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন বছরে এর অর্ধেক মাছ ধরা চলতে পারে, তার চেয়ে বেশি ধরলে শীগ্‌গিরই ভূমধ্যসাগরের সব মাছের প্রজাতি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

ভূমধ্যসাগরের দূষিত পানির জন্য এর মধ্যেই এখানকার অনেক জলজ উদ্ভিদ আর প্রাণী মরে যেতে আরম্ভ করেছে। ফরাসী উপকূলের একটি এলাকায় ১৯৬০ সালে ১৭০ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীর হদিস পাওয়া গিয়েছিল; সেখানে আজ পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৩০ প্রজাতি। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের ডিম পাড়ার এলাকা দূষিত হয়ে পড়ায় আটলান্টিকের মূল্যবান নীল-পাখনা টুনা মাছের পরিমাণ এর মধ্যে নব্বই শতাংশ কমে গেছে। আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষা ইউনিয়ন (IUCN) হুশিয়ারি দিয়ে বলেছে, এখনই যদি পার্শ্ববর্তী দেশগুলো প্রতিকারের ব্যবস্থা না নেয় তাহলে শীগ্‌গিরই ভূমধ্যসাগর হয়ে দাঁড়াবে একটা ময়লা পানিভর্তি মরা সাগর।

www.banglainternet.com

Goto List

কেন এমন সমস্যা

আজকের পরিবেশের যে সব সমস্যা তার গোড়া অনেকটা খুঁজে পাওয়া যাবে দু'শ বছর আগে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির যে ধারা তার মধ্যে। পরিবেশের ওপর মানুষের আধিপত্য বিস্তারের ফলে মানুষের বস্তু ও শক্তিসম্পদের ব্যবহার বেড়েছে, বেড়েছে তার জীবনমান, আয়ুষ্কাল। কিন্তু আবার সেই সঙ্গে মানুষ বেহিসেবীভাবে পরিবেশের নানা সম্পদ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। তার ওপর দ্রুতগতিতে বেড়েছে জনসংখ্যা। তাতে প্রকৃতির মধ্যে নানা বস্তুর পুনর্জীবন ও নবায়নের জন্য যে সূক্ষ্ম পরস্পরনির্ভর ভারসাম্য প্রয়োজন, তা আজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। এই ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করলে সমগ্র মানব সভ্যতার সামনে আজ সমূহ বিপদ।

প্রকৃতির সম্পদের নির্বিচার বেহিসেবী ব্যবহারের ফলে দেখা দিয়েছে ধাতু, খনিজ জ্বালানি, বন প্রভৃতি নানা বস্তুসম্পদ নিঃশেষ হয়ে আসার আশঙ্কা। শিল্পক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে নানা নতুন নতুন বিষাক্ত বস্তু, প্রকৃতিতে আপনাআপনি ক্ষয়ে যায় না এমন সব বর্জ্যপদার্থ। এমন বিপুল আকারে এসব বস্তু তৈরি হচ্ছে যা পরিবেশের ওপর সৃষ্টি করছে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া। এবং সব কিছু মিলিয়ে মানুষের সমগ্র উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি কি হবে এবং পরিবেশের ওপর তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি ঘটবে এই প্রশ্নটি আজ রীতিমতো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

পৃথিবীতে শিল্পপণ্যের উৎপাদন দ্রুতগতিতে বাড়ছে। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিও আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। কিন্তু তাতে সামগ্রিক পৃথিবীর দারিদ্র পরিস্থিতির সুরাহা হচ্ছে না। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে গত তিন দশকে স্থির মূল্যে মাথাপিছু বার্ষিক আয় বাড়ছে না; মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণও কমছে। ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে শতকরা ষাট ভাগের ওপর দাঁড়িয়েছে; দারিদ্রসীমার নিচে জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ। এই অবস্থা ঘটছে পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে।

এটা আজ স্পষ্ট যে, জনগণের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার স্বার্থে উন্নয়ন ব্যাহত করার প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলোর জন্য উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরি। তবে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কোন্ ধরনের উন্নয়ন আমরা চাইব। পাশ্চাত্যে যে ধারায় উন্নয়ন চলেছে তাতে অনেক ক্ষেত্রে মুনাফালোভী বেনিয়াবুদ্ধির প্রকোপে মুনাফার অঙ্ক বেড়েছে প্রকৃতির ভারসাম্য ধ্বংসের বিনিময়ে। তাতে প্রায়শ আপাত আর সাময়িক উন্নয়নের ধাঁচ দেখা যাচ্ছে অতিমাত্রায় ভঙ্গুর।

তা বলে উন্নয়ন মাত্রই ধ্বংসকর হবে এমন কোন কথা নেই। বিজ্ঞানের আশ্চর্য নানা অবদানের ফলে ইতিহাসে এই প্রথম পৃথিবীর সব মানুষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যের সংস্থান হওয়া সম্ভব; অধিকাংশ ব্যাধির নিরাময়ের পদ্ধতি আজ মানুষের আয়ত্তে—মহামারী ও অকাল মৃত্যু আজ তাই উন্নত বিশ্বে অতি বিরল হয়ে উঠেছে। শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। প্লেগ, বসন্ত, কলেরা, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি নানা কালব্যাধি আজ মানুষের নিয়ন্ত্রণে। গত এক শ' বছরে

www.banglainternet.com

Goto List

পৃথিবীতে শিল্পপণ্যের উৎপাদন বেড়েছে অন্তত পঞ্চাশ গুণ। এই শতক শেষ হতে হতে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হবে নগরবাসী।

পরিবেশের স্বাস্থ্যের জন্য আরেক বড় রকম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে সমরায়োজন। পৃথিবীতে আজ প্রতি বছর নারী-শিশু-বৃদ্ধ প্রত্যেক মানুষের মাথাপিছু প্রায় দেড় শ' ডলার ব্যয় হচ্ছে যুদ্ধের আয়োজনে। এই অঙ্ক সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ছ' শতাংশের মতো এবং উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে যে সাহায্য দেয় তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। অথচ সমগ্র পৃথিবীতে শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় এই অঙ্কের মোটামুটি অর্ধেক আর স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য ব্যয় হয় মোটামুটি এক-চতুর্থাংশ। স্পষ্টতই রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকরা এক অবাস্তব নিরাপত্তা ব্যবস্থার মায়ার হরিণের পেছনে ছুটে চলেছেন।

পরিবেশের বিষয়গুলো যে কোনো দেশের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে না এ সত্যও আজ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আবহাওয়া যেমন একই সঙ্গে দেশজ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক তেমনি পরিবেশের সমস্যাগুলোও মূলত দেশের সীমা ডিঙ্গিয়ে যায়। তাই এক্ষেত্রে আজ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দাবি জোরালো হয়ে উঠছে। আরো একটি সত্য আজ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, পরিবেশগত সমস্যার সমাধান নির্ভর করে সমগ্র জনসমাজের সচেতন কর্মোদ্যোগের ওপরে। তার জন্য বিশেষ করে প্রয়োজন সমগ্র জনসমাজের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ে জ্ঞান ও উপলব্ধির সঞ্চার। এজন্য যেমন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশের জ্ঞানকে গুরুত্ব দিতে হবে, তেমনি অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন তথ্য-সম্প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সঞ্চারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অর্থাৎ সব মিলিয়ে সারা পৃথিবীতে আজ যে বিপুল পরিবেশগত সমস্যা দেখা দিয়েছে তাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। আবার উন্নয়নও আজ আর সংকীর্ণ অর্থে শুধু দেশের মোট ধন সম্পদের বৃদ্ধি নয়। এই অর্থসম্পদের বৃদ্ধি যদি গুটিকতক মানুষের সমৃদ্ধির প্রয়োজনে চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশকে কলুষিত করে তোলে তাহলে সে উন্নয়ন হতে পারে সমাজের জন্য আত্মঘাতী। তাই উন্নয়নের জন্য চাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি —উন্নয়ন হতে হবে দেশের সব মানুষের স্বার্থে। দেশের সব মানুষের কল্যাণ ও বিবেচনাবোধের ওপর নির্ভর করবে উন্নয়নের প্রকৃতি। বলা বাহুল্য, সব মানুষকে তাই দিতে হবে শিক্ষার সুযোগ, পরিবেশ সংক্রান্ত সব তথ্য জানবার এবং বুঝবার সুযোগ। যে দেশে ৬৫ শতাংশ লোক নিরক্ষর, প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের মাত্র ৮০ শতাংশ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ের মাত্র ৩০ শতাংশ শিক্ষার সুযোগ পায় সে দেশে এই কাজটি হয়ে দাঁড়ায় রীতিমতো জটিল।

উন্নয়নের সমস্যা আজ যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা আর যেখানে এই ভারসাম্য বিপর্যস্ত তার পুনঃস্থাপন। আবার এই প্রয়োজন সারা পৃথিবীতে যেমন জরুরি, তার চেয়েও বেশি জরুরি বোধ হয় বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে—যেখানে জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ, প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ অপ্রতুল এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার

www.banglainternet.com

Goto List

বিশ্বসমাজের আশঙ্কার কারণ। এদেশে আমাদের আর কালক্ষেপের সুযোগ নেই। এখনই প্রয়োজন পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জরুরি পদক্ষেপ, সমগ্র জনসমাজকে সচেতন করে তোলার আয়োজন, বিশেষ করে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন তরুণ সমাজকে যাদের আচরণ ও কর্মধারার ওপর নির্ভর করবে আগামী দিনের সমাজ, দেশ ও পৃথিবীর পরিবেশ।

সবারই রয়েছে নাগরিক দায়িত্ব

আজকাল পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা এবং যানবাহন ও কলকারখানা বাড়ার ফলে পরিবেশ দূষণের মাত্রা আগের চাইতে বহু গুণে বেড়েছে। আমরা এ বিষয়ে সচেতন না হলে এই দূষণ ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠে এ পৃথিবী একদিন মানুষ বাসের অযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। এসব দূষণের মধ্যে কয়েকটি বিষয় বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে:

ক. কলকারখানা চলে কয়লা, তেল প্রভৃতি জ্বালানি পুড়িয়ে। এসব কারখানার ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়। এই ধোঁয়ায় থাকে নানা বিষাক্ত গ্যাস আর ধুলোর কণা। এ সবই আমাদের চারপাশের হাওয়াকে বিষাক্ত করছে।

খ. এমনিভাবে জ্বালানি পুড়ছে মানুষের ঘরে ঘরে, রেলগাড়ি, মোটর গাড়ি, লঞ্চ এসব যানবাহন চালাতে। তার ফলেও দূষিত হয়ে উঠছে চারপাশের বাতাস।

গ. কলকারখানায় জ্বালানি পোড়ানো ছাড়াও সৃষ্টি হচ্ছে নানা ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ। চামড়ার ট্যানারি, সাবানের কারখানা, কাগজ কল, সার কারখানা এসব থেকে বিষাক্ত বর্জ্য নির্বিচারে নদীনালার পানিতে ফেলা হচ্ছে। তাতে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে।

ঘ. নগরে বা গ্রামে অধিকাংশ মানুষের জন্য শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগও দূষণ ঘটাচ্ছে পরিবেশের। তেমনি অনেক এলাকাতেই ভাল আবর্জনা নিষ্কাশনেরও ব্যবস্থা নেই। এতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে।

ঙ. জ্বালানির জন্য আজকাল গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। গাছপালা হাওয়া থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শুষে নেয়। গাছপালা কমে যাওয়ায় বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে।

চ. আজকাল চাষবাসের জন্য ক্ষেতে অতি বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। উন্নত দেশে যেসব কীটনাশক মানুষের জন্য ক্ষতিকর বলে বাতিল করা হয়েছে সেসব এখনও আমাদের দেশে চলছে। ক্ষেতে সারও প্রায়শ দেওয়া হচ্ছে জমির বা ফসলের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা না করে। এসব সার ও কীটনাশক ধুয়ে গিয়ে নদীনালা বিষাক্ত হয়ে উঠছে।

ছ. আধুনিক কালে এক নতুন ধরনের দূষণ দেখা দিয়েছে, সে হল তেজস্ক্রিয়ার দূষণ। পরমাণু-অস্ত্রের পরীক্ষার ফলে বায়ুমণ্ডলে অদৃশ্য অথচ মারাত্মক তেজস্ক্রিয়া ছড়িয়ে

www.banglainternet.com

Goto List

পড়ছে। কখনো কখনো পরমাণু অস্ত্রের বা পরমাণু-শক্তির কারখানায় দুর্ঘটনার ফলেও তেজস্ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে। ১৯৮৬ সালে চরনোবিলে পরমাণু-শক্তিকেন্দ্রে বিস্ফোরণের ফলে ইউরোপের অনেক এলাকাতে ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয়া ছড়িয়ে যায়।

জ. কলকারখানা বা যন্ত্রপাতির কর্কশ শব্দ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এর ফলে পরিবেশে যে দূষণ ঘটে তাকে বলা হয় শব্দদূষণ। যানবাহনের হর্ন বা ঘড়ঘড় শব্দও এমনি পরিবেশ দূষণ ঘটাতে পারে।

এসব দূষণ দূর করতে হলে প্রথমে আমাদের নানা রকম দূষণের ধরন এবং কারণ সম্বন্ধে জানতে হবে। দেশের সব মানুষকে এসব দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বোঝাতে হবে। সারা দেশের মানুষ যদি পরিবেশের দূষণ রোধে তাদের নাগরিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয় তাহলে এসব দূষণ অনেকখানি কমিয়ে আনা, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব।

www.banglainternet.com

Goto List

জলাজমি যেন সোনার খনি

ভরা বর্ষায় বাংলাদেশের মাঠঘাট পানিতে থই থই করে। প্রতি বছরই বর্ষাকালে এদেশে এমন হয়। শহরের রাস্তাতেও প্যাচপেচে কাদা হয়, গ্রামের পথে তো কথাই নেই। অনেক জায়গায় পানির জন্য যাতায়াত হয় দুঃসাধ্য, কোথাও কোথাও নৌকো বা ভেলাই হয় একমাত্র ভরসা। হাজার হাজার লোকের ঘরবাড়ি ডুবে যায় পানিতে, তাদের কষ্টের সীমা থাকে না। এমন দেশে জলাজমিকে সোনার খনির সঙ্গে তুলনা করা হয়তো পরিহাস বলে মনে হবে। তা হোক, তবু বিজ্ঞানীরা বলছেন কথাটা সত্যি।

জলা জায়গা যে শুধু মাছের আবাস তা নয়; জলাভূমিতে জন্মায় হাজার রকম জলজ উদ্ভিদ আর প্রাণী। এসব উদ্ভিদ আর প্রাণী বন্দী করে রাখে সূর্যের শক্তিকে। উদ্ভিদেরা মানুষের জন্য সৃষ্টি করে অক্সিজেন; মাছ ও অন্যান্য প্রাণীরা দেয় প্রচুর প্রোটিন আর অন্যান্য খাদ্য-উপাদান। জলা জায়গা সূর্যের শক্তি যেভাবে জমা করতে পারে সচরাচর সমান পরিমাণ জায়গায় ডাঙ্গায় এমন হয় না। তাই এসব এলাকা বিজ্ঞানীদের চোখে সবচেয়ে সুফলা অঞ্চল বলে গণ্য। এমনি জলা জায়গায় যে পরিমাণ ও যত বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মায় তার সঙ্গে কেবল আমাজনের মতো নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের তুলনা করা চলে। আর এজন্যই জলা জায়গাগুলো বহু প্রজাতির যাযাবর ও অন্যান্য ধরনের পাখিদের প্রজনন ও চারণক্ষেত্র।

মানুষের আবাস ও বিচরণ প্রধানত মাটির ওপরে। তাই তার সভ্যতাও মূলত ডাঙ্গাকে ভর করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু তবু জল-পরিবেশকে বাদ দিয়ে মানুষের চলে না। নদী-সমুদ্রের ওপর দিয়ে অজস্র জলযান আমাদের যাতায়াতকে সহজ করে; নদী-হ্রদ-সমুদ্র যোগায় মাছ এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী। জলাজমিগুলো তার বুকে টেনে নেয় প্লাবনের পানিকে; সুষম রাখে জলবায়ু। কিন্তু তার পরও আমরা প্রায়শ ভুলে যাই যে, আমাদের এই পৃথিবীর ওপরকার মাত্র ২৯ শতাংশ এলাকা ডাঙ্গা, বাকি ৭১ শতাংশই জলভাগ। আর ডাঙ্গার এলাকাতেও জলাজমিগুলো মানুষের অর্থনীতি আর জীবনযাত্রায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করে আছে।

www.banglainternet.com

Goto List

পৃথিবীর ওপর মানুষ প্রভৃতি প্রাণী, বিপুল সংখ্যক কলকারখানা আর যানবাহন কেবলই নানা ধরনের জ্বালানি পুড়িয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি করছে; সেই কার্বন ডাই-অক্সাইডে কলুষিত হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডলকে শোধনের দায় বহন করছে গাছপালা। গাছপালা সালোক-সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্মস্থ করে তাকে পরিণত করছে খাদ্যে, আর বিনিময়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়ে দিচ্ছে আমাদের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় অক্সিজেন। এই পদ্ধতিতে সারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যত অক্সিজেনের যোগান আসছে তার প্রায় সত্তর শতাংশ দিচ্ছে সমুদ্রের শেওলা, প্লাঙ্কটন প্রভৃতি উদ্ভিদ। এছাড়া সারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া, জলবায়ু এসবের পেছনেও বিরাট ভূমিকা রয়েছে পৃথিবীর জলমণ্ডলের।

ডাঙ্গার ওপরকার যে জলা জায়গা তার কথাতেই আসা যাক। পৃথিবীর ওপর এ ধরনের জলা জায়গার মোট পরিমাণ আজ খুব বেশি নয়; সারা পৃথিবীর হিসেব নিলে দু'তিন শতাংশের মতো হবে। এর মধ্যে পড়ে নানা এলাকার বিল, খাল, নালা, জলাভূমি, নদী, হ্রদ, পুকুর, দীঘি, খাড়ি, নদীমোহনা, হাওর, বাওর এ সবই। এসব এলাকায় কোথাও কোথাও পানি থাকে সারা বছর; কোথাও পানি থাকে বছরের খানিকটা সময়। কোথাও পানি আবদ্ধ, স্থির, কোথাও পানিতে প্রবাহ আছে। কোথাও এসব জলাশয় রয়েছে আবহমান কাল থেকে, কোথাও সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রতিক কালে।

আসলে পৃথিবীতে জলাজমির পরিমাণ আগে আরো অনেক বেশি ছিল। মানুষের সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জলাজমির পানি ছেঁচে ফেলে বা ভরাট করে সেসব এলাকায় মানুষ বসত গড়ে তুলেছে বা চাষের জমি তৈরি করেছে। এই শতকের ষাটের দশকে যখন সারা পৃথিবী জুড়ে পরিবেশের দূষণ ও অবনতি সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে উঠতে থাকে তখন এসব জলাজমির গুরুত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে সচেতন হয়ে উঠতে আরম্ভ করেন। ক' বছর আগে হিসেব করে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যে পরিমাণ জলাজমি ছিল তার মাত্র ৯ শতাংশ অবশিষ্ট আছে; ওহায়ো অঙ্গরাজ্যে আছে ১০ শতাংশ, আয়োয়াতে আছে ১১ শতাংশ, ইন্ডিয়ানা আর মিজৌরিতে আছে ১৩ শতাংশ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জলাজমির পরিমাণ কমতে কমতে আজ মোট জমির মাত্র পাঁচ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে যে পরিমাণ জলাজমি অবশিষ্ট আছে তার গুণগত মান দ্রুত নেমে যাচ্ছে নানা ধরনের দূষণের কারণে। এভাবে জলাজমি নিঃশেষ হয়ে আসায় সে দেশের অনেক উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও পাখি প্রজাতি উপযুক্ত আবাস ও খাদ্যের অভাবে ধ্বংসের মুখোমুখী হয়েছে। আজ তাই সেদেশে জলাজমি রক্ষার জন্য নতুন করে আইন পাশ করতে হচ্ছে। কিন্তু এসব আইনও জলাজমি রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয় বলে পরিবেশবাদী বিজ্ঞানীদের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

www.banglainternet.com

Goto List

বাংলাদেশে জলাজমি

বাংলাদেশ জলাজমির দিক থেকে বিশেষ ভাগ্যবান বলা যেতে পারে। এদেশের সত্তর থেকে আশি লাখ হেক্টর এলাকা অর্থাৎ দেশের মোট জমির প্রায় অর্ধেক জলাজমি বলে গণ্য হতে পারে। এর মধ্যে তিনটি বিশাল নদী প্রবাহের (গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও সুরমা-মেঘনা) অববাহিকায় সাত-আট লাখ হেক্টর এলাকা স্থায়ীভাবে জলমগ্ন থাকে। ছোট বড় শাখানদী-উপনদী মিলিয়ে ৭০০ নদ-নদী (প্রায় ২৪,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ) জুড়ে আছে প্রায় পাঁচ লাখ হেক্টর এলাকা। এক হাজারের ওপর বিল, হাওর-বাওর মিলিয়ে অধিকার করে আছে প্রায় দু'লাখ হেক্টর। প্রায় এক লাখ হেক্টর জুড়ে আছে বড় বড় দীঘি আর প্রায় দেড় লাখ হেক্টর জুড়ে আছে প্রায় লাখ দশেক ছোটখাট পুকুর আর জলাশয়। এছাড়া প্রতি বছর বর্ষাকালে চার-পাঁচ মাস পানিতে তলিয়ে থাকে এমন চাষের জমি আছে প্রায় ৫৮ লাখ হেক্টর। বর্ষাকালে প্রতি বছরই দেশের প্রায় অর্ধেক এলাকা (কোন বছর তিন-চতুর্থাংশ) পরিণত হয় জলাজমিতে।

এসব জলাজমি বিপুল পরিমাণ মাছ ও অন্যান্য বন্য প্রাণীর আবাস। বাংলাদেশের নদ-নদী-বিল হাওরে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মিষ্টি পানির মাছ জন্মায়। পানির ধারে বাস করে প্রায় ১৫০ প্রজাতির পাখি। বাংলাদেশে প্রায় পঞ্চাশ লাখ লোকের জীবিকা নির্ভর করে মাছ ধরার ওপর। দেশে প্রতি বছর মিঠা পানির মাছ, চিংড়ি, ব্যাঙ প্রভৃতি জলজ প্রাণী ধরা হয় প্রায় আট লাখ টন। এসব আমাদের খাদ্যে অতি জরুরি প্রোটিন সরবরাহ করে; এর বেশ খানিকটা অংশ রপ্তানিও হয়। কিন্তু আজ বাংলাদেশে জলাজমি নানাভাবে সঙ্কুচিত ও দূষিত হয়ে ওঠার ফলে অনেক প্রজাতির মাছ আর পাখি ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা এবং সিলেটের হাওর অঞ্চলের জলাজমিতে ব্যাপকভাবে ধান ও পাটের চাষ হয়। শুকনোর সময়ে জলাজমি থেকে ক্ষেতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। এসব জলাজমি ভূগর্ভের জলসমতল রক্ষা করে আমাদের পানীয় জল সরবরাহেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; অনেক সময় খোলা জলাশয় থেকে সরাসরিও পানীয় জল সংগ্রহ করা হয়। জলাজমিতে প্রচুর গরু-বাছুর চরে; জলা জায়গা থেকে সংগ্রহ করা খড় বর্ষাকালে গরুবাছুরের খাদ্য যোগায়।

দেশে জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে; তার ফলে জলাজমির ওপর আজ ক্রমেই চাপ বাড়ছে। নদী-খাল-বিল থেকে বড়-ছোট নির্বিশেষে সব মাছ ছেঁকে তোলা হচ্ছে, বিশেষ করে কোন জলাশয় যখন মাছের ব্যবসায়ীদের কাছে ইজারা দেয়া হয় তখন তারা মাছের বংশ রক্ষার কথা না ভেবে সব মাছ নিঃশেষে তুলে নেবার চেষ্টা করে। এর ফলে অনেক এলাকায় মাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা ফল হয়েছে এই যে, সব অনাবাদী জমি ক্রমান্বয়ে চাষের আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার ফলে অনেক বিল অঞ্চলের পানি ছেঁচে ফেলে তাকে

www.banglainternet.com

Goto List

ধানের জমিতে পরিণত করা হচ্ছে। এতে সেই এলাকার সব জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠছে। এভাবে দেশের অনেক বিল আজ শুকিয়ে উঠছে। এই প্রক্রিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল পাবনা জেলার চলন বিল। এই বিলটির এককালে আয়তন ছিল এক লাখ হেক্টরের ওপর; কিন্তু আজ তার এলাকা এক-চতুর্থাংশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে এই অবশিষ্ট অংশেরও শুধু এক-তৃতীয়াংশে এখন সারা বছর পানি থাকে। অবিলম্বে প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে চলন বিল অঞ্চলের পরিবেশের অবনতি রোধ করার আর কোন উপায় থাকবে না।

দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গত ক'বছর জমিতে জলসেচের জন্য গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভের পানি তোলা হয়েছে। তাছাড়া গঙ্গার উজানে বাঁধ দেয়াতেও এই অঞ্চলের পানি সরবরাহ কমেছে। এসব মিলিয়ে উত্তরাঞ্চলে মরুপ্রবণ জলবায়ু দেখা দিয়েছে। দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে আরেক ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। নদীর উজান থেকে মিঠা পানির সরবরাহ কমে যাওয়ায় দক্ষিণের সমুদ্র থেকে লোনা পানি নদীতে এসে ঢুকছে। তাতে উপকূল অঞ্চলের পশু-পাখি, মাছ, গাছপালা, চাষবাস ও সমগ্র জীবনধারার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

'উন্নয়ন'-এর বিপদ

অন্যান্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নানা ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের ফলে জলাজমির পরিবেশের ওপর আজ বড় ধরনের হুমকি দেখা দিয়েছে। এই হুমকি এসেছে নানা দিক থেকে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় মানুষের কৃষিজমি ও বসতির বিস্তার; শিল্প, কৃষি ও গার্হস্থ্য বর্জ্য পদার্থের দূষণ, বেহিসেবী ধরনের মাছ ধরা, গরানবন ও অন্যান্য জলাজমি অঞ্চলে ব্যাপক বৃক্ষ নিধন, জল-অববাহিকার অবনতির ফলে ভূমিক্ষয়, পলি পড়া প্রভৃতি। মিঠা পানির জলাজমির অবনতির অনেকগুলো কারণ রয়েছে:

ক. দেশের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়তে বাড়তে আজ জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮০০-র ওপর দাঁড়িয়েছে। এতে বসতি ও কৃষির জন্য সকল পতিত জমির ওপর চাপ পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে জলাজমির পানি ছেঁচে ফেলে তাকে বসত ও চাষের কাজে লাগানো হচ্ছে। এর ফলে মাছের আবাস নষ্ট হয়ে মাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে; তাতে মানুষের খাদ্যে প্রোটিনের সরবরাহ ক্রমেই কমছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অরেক ফল হল কৃষি জমিতে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বাড়ছে; তার একটা বড় অংশ ধুয়ে নেমে নদীর পানিতে মিশছে এবং সে পানির অক্সিজেনের সরবরাহ কমিয়ে দিয়ে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জীবন সংশয় ঘটাচ্ছে। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে বিপুল জনসংখ্যার জৈব আবর্জনা নদীর পানিতে মিশে সে পানির দূষণ ঘটাচ্ছে।

www.banglainternet.com

Goto List

খ. বাংলাদেশে ছোট-বড় কলকারখানার অধিকাংশই গড়ে উঠেছে নদীর ধারে। কাগজ কল, সাবানের কারখানা, ট্যানারি, রাসায়নিক সারশিল্প, পাটকল, কাপড়ের কল এসব কারখানা থেকে তরল বর্জ্য পদার্থ গিয়ে নদীর পানিতে মেশে এবং তাতে অক্সিজেনের অভাব ঘটে যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে তাতে নদীর সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটে।

গ. গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার নদী সমাবেশ প্রতি বছর প্রায় আড়াই শ' কোটি টন মাটি-কাঁকর-পলি বয়ে নিয়ে যায়। এর বেশির ভাগই আসে পাড় ভেঙ্গে পড়ার ফলে। এই পাড় ভাঙ্গার মাধ্যমে কৃষি জমির ব্যাপক ভূমিক্ষয় ঘটছে এবং এগুলো নদীর তলায় তলানি হিসেবে জমছে। এতে কোথাও চর পড়ছে, কোথাও নদীর গভীরতা কমে গিয়ে জলজ পরিবেশের অবনতি ঘটাচ্ছে।

ঘ. দেশে নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলেও অনেক ক্ষেত্রে জল-পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে অনেক রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেগুলো তৈরির সময় প্রায়শ বন্যার পানির স্বাভাবিক চলাচলের গতিধারা বিবেচনায় নেয়া হয় নি। তার ফলে পানি নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি হয়ে নানা জায়গায় জলাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে; আবার কোথাও দেখা দিচ্ছে পানির অভাব। তেমনিভাবে বন্যার প্রকোপ কমাবার জন্য অনেক জায়গায় বাঁধ দেয়া হয়েছে কিন্তু এর ফলে যে দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া ঘটবে তার কথা হিসেবে ধরা হয় নি। বাঁধের দরুন নদীতে পলি পড়ার হার বেড়ে গিয়ে পানির প্রবাহ স্তিমিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত আরো ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি হয়েছে।

ভুল পরিকল্পনা যে কিভাবে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে তার একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল খুলনা ও যশোর জেলায় বিল ডাকাতিয়ার জলাবদ্ধতা। এখানে এক বিশাল এলাকায় চাষের জমিকে জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানি থেকে রক্ষা করার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদের তৈরি এক পরিকল্পনা অনুযায়ী ষাটের দশকে একটি বাঁধ তৈরি হয়। বিল এলাকা থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়ার জন্য এই বাঁধে তিনটি স্লুইস গেটের ব্যবস্থা করা হয়। তাতে কিছুদিন এই এলাকায় প্রচুর ফসল ফলে আর কৃষকদের মুখে হাসি দেখা দেয়। কিন্তু ক'বছর যেতে না যেতেই স্লুইস গেটগুলো বিকল হয়ে পড়ে। তার ফলে কৃষকদের হাসি শীগ্‌গিরই কান্নায় পরিণত হয়।

আশির দশকের শুরু থেকে বিল ডাকাতিয়ার প্রায় ২৪ কি.মি. দীর্ঘ আর ১৬ কি.মি. প্রস্থ (প্রায় ৩২,০০০ হেক্টর বা ৩২০ বর্গকিলোমিটার) এলাকা নোনা পানিতে জলমগ্ন হয়ে আছে। নোনাধরা মাটি হয়ে উঠেছে নিষ্ফলা; প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের ঘরবাড়ি আর রুজি-রোজগার এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; কিন্তু কোন মহল থেকে তার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। এলাকার বিক্ষুব্ধ জনগণ একত্র হয়ে সেপ্টেম্বর ১৯৯০-এ বাঁধের খানিকটা অংশ কেটে

www.banglainternet.com

Goto List

দেয় কিন্তু তাতেও সমস্যার সুরাহা হয় নি। অবশেষে সরকারের টনক নড়েছে কিন্তু তবু বিল ডাকাতিয়ার জলাবদ্ধতার সমস্যার সমাধান হতে হয়তো বিশ শতক পেরিয়ে যাবে। বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় যে বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে তাতেও ব্যাপক আকারে বাঁধ নির্মাণের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে; এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে পরিবেশের ওপর নানা ধরনের প্রতিকূল অভিঘাত পড়তে পারে বলে অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করছেন।

পরিবেশের অবনতির ফল

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কারণে জলাজমির পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে; আবার যেসব জলাজমি এখনও টিকে আছে সেসব এলাকার পরিবেশের ক্রমেই অবনতি ঘটছে। এমনি অবনতির একটি অবশ্যম্ভাবী ফল হল জলাজমিতে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে তাদের জীবন সংশয় ঘটা।

বাংলাদেশের জীবসম্পদের বিপুল বৈচিত্র্য এদেশের একটি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। এদেশে রয়েছে বহু প্রজাতির স্তন্যপায়ী, পাখি, সরীসৃপ ও উভচর। উপকূল অঞ্চলে গৃহায়ন, কৃষিজমির বিস্তার, ভূমিক্ষয়ের ফলে পলি পড়া প্রভৃতির কারণে জলজ পরিবেশের ওপরে যে প্রভাব পড়ছে তাতে জীবকুলের জন্য সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে গত কয়েক দশকের মধ্যে বেশ কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এবং আরো অনেক প্রজাতির অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে।

স্তন্যপায়ীর মধ্যে এক-শিং গণ্ডার, বুনো মহিষ, নীলগাই এসব এর মধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। পাখির মধ্যে এর মধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে গোলাপী হাঁস ও বেঙ্গল ফ্লোরিক্যান; বিলুপ্তির পথে রয়েছে দেওহাঁস আর নাফতা হাঁস। সরীসৃপদের মধ্যে ঘড়িয়াল এখন প্রায় বিলুপ্ত; বেশ কয়েকটি প্রজাতির কুমির ও কচ্ছপ বিলুপ্তির মুখে। মাছের মধ্যে মহাশোল আর নান্দিনা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সরপুঁটি বিলুপ্তির পথে। স্বভাবতই অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যেও এভাবে অনেক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে। আর ঠিক একইভাবে বিলুপ্ত হচ্ছে নানা প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ। এখন যে হারে পরিবেশের অবনতি ঘটছে তা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে যে প্রজাতি ধ্বংসের হার আরো বাড়বে তাতে সন্দেহ নেই। অবশেষে মানুষের জীবনেও তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

এ সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য আজই আমাদের দেশের নানা ধরনের জলজ পরিবেশ সম্পর্কে ব্যাপক জরিপ এবং গবেষণার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি এবং পরিবেশের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া নিয়েও গবেষণা শুরু করতে হবে। বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী এক জটিল খাদ্যশৃঙ্খলে বাঁধা; একের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব তাই অন্য অনেকের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অনেক ক্ষেত্রে এসব উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের খাদ্য-বস্ত্র-ওষুধ প্রভৃতির উপকরণ যোগায়, কখনো আরো

www.banglainternet.com

Goto List

নানাভাবে আমাদের পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এসব সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান তাই আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

সচেতনতা আর সহযোগিতা

পরিবেশের সুস্বাস্থ্যের জন্য যেমন গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জনগণের সচেতনতা। শেষ বিচারে, জনগণই পরিবেশের সঙ্গে নিরন্তর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তার উন্নতি বা অবনতি ঘটায়। তাই ব্যাপক জনগণের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সুস্থ চেতনার বিস্তার না ঘটলে পরিবেশের সুস্থতা রক্ষা বা তার উন্নয়ন ঘটানো কঠিন।

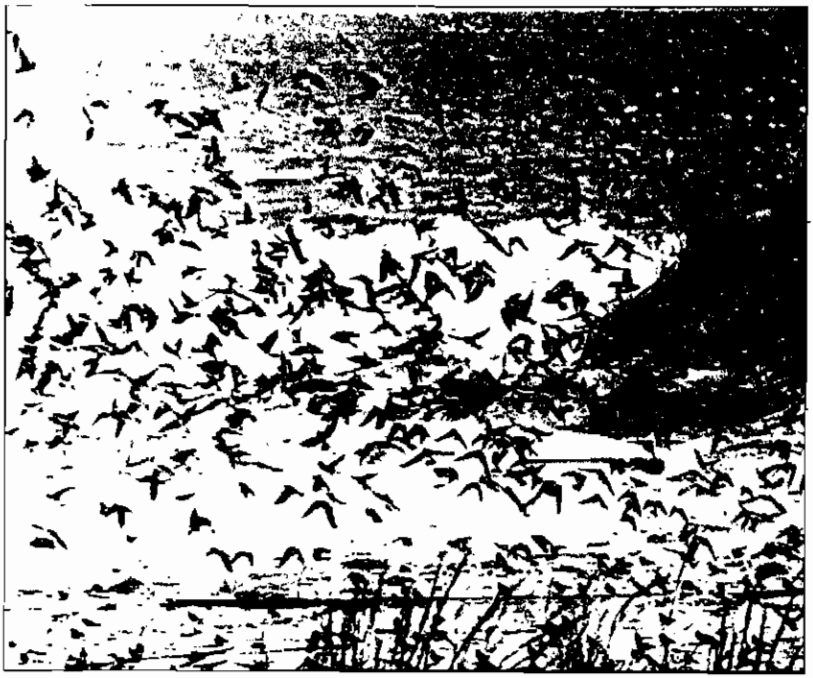

জলা জায়গাগুলি সাধারণত বিপুল জীবসম্পদে সমৃদ্ধ

আমাদের দেশের অনেক শহুরে মানুষের মনে বর্ষা বা বন্যা সম্পর্কে একটা ভীতিজনক ধারণা রয়েছে। কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষ বর্ষা ও বন্যাকে ঠিক এক চোখে দেখেন না;

www.banglainternet.com

Goto List

তাঁরা এ দুয়ের মধ্যে তফাত করেন এবং সময়োচিত ও যথাযথ মাত্রার বর্ষাকে তাঁদের কৃষিকাজ ও জীবনযাত্রার অবশ্য প্রয়োজন অনুষঙ্গ বলে গণ্য করেন। বর্ষার শেষে জমিতে যে পলি পড়ে তা জমির উর্বরতা বাড়ায় এবং তাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে। এদেশের কৃষকরা সেটা ভালভাবেই জানেন; আর তাই স্বাভাবিক মাত্রার বর্ষাকে তাঁরা ভয় তো পানই না, বরং তাকে স্বাগত জানান। এদেশের প্রকৃতি ও মানুষের এ ধরনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই আমাদের এগোতে হবে; সম্পূর্ণভাবে বন্যার পানির আগমনকে প্রতিহত করে তাই বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু এদেশের মানুষের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রচনার যে জ্ঞানগত ভিত্তি তা দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও তৈরি হয়নি। এদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তাই পানির দেশ বাংলাদেশের জলজ পরিবেশ নিয়ে আরো প্রচুর গবেষণার এবং সেসব গবেষণার ফলাফল দেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজন রয়েছে।

এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পানি কিভাবে দূষিত হচ্ছে, তার ফলে বিভিন্ন আণুবীক্ষণিক জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর এবং অন্য জীবকুলের ওপর কি ধরনের প্রভাব পড়ছে, বিভিন্ন ধরনের দূষণের ফলাফল কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় এমনি নানা বিষয় নিয়ে ব্যাপক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। পরিবেশগতভাবে এবং আর্থসামাজিকভাবে জলজ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার বাস্তব পন্থা নিয়েও যথেষ্ট বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফল শুধু বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে। সেসব তথ্য বা প্রযুক্তি দেশের নীতিনির্ধারকদের কাছে বা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে পৌছয় না। তার ফলে পরিবেশের দূষণ বা অবনতি আগের মতোই অব্যাহত ধারায় চলতে থাকে। আর তাই যেমন দেশের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা স্তরে তেমনি নানা ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা প্রদর্শন, পোস্টার প্রদর্শন, আলোচনা সভা প্রভৃতির আয়োজন সরকারী-বেসরকারী সকল মহলের উদ্যোগে হওয়া প্রয়োজন। বিপুল জনসংখ্যা ও আরো নানা চাপে জর্জরিত বাংলাদেশ আজ পরিবেশগত যে সব জটিল সমস্যার সম্মুখীন একমাত্র সমগ্র দেশের জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগ আর সহযোগিতার মাধ্যমেই তার মোকাবিলা করা সম্ভব।

www.banglainternet.com

নদীরা হ্রদেরা কেন মরে যায়

ঢাকা শহরে আজ পাড়ায় পাড়ায় পানির সংকট। শহরে যত পানির দরকার তার অর্ধেকও সরবরাহ করতে পারছে না ঢাকা ওয়াসা। পানির অভাবে রাস্তার ধারের কলে দেখা দিচ্ছে লম্বা লাইন; কোথাও পানির জন্য হন্যে হয়ে ফিরছে মানুষ।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মরুভূমির লক্ষণ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গাছপালা নিধনের ফলে বৃষ্টিপাত কমে গিয়েছে; খরা হচ্ছে প্রায় প্রতি বছরই। ভূগর্ভের পানির স্তরও বিপজ্জনকভাবে নিচে নেমে গিয়েছে, টিউবওয়েল থেকে আর সেচের পানি উঠছে না। তার ফলে কৃষকরা তাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফসল শেষ পর্যন্ত ঘরে তুলতে পারছে না।

ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়ায় পদ্মার পানি প্রবাহ কমতে কমতে আজ এক নিম্নতম পর্যায়ে নেমে এসেছে। এককালের প্রমত্তা পদ্মা আজ শুকনোর সময়ে মানুষ হেঁটে পার হচ্ছে। নদীর পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় শুধু যে নৌচলাচল আর মাছের সরবরাহ সঙ্কুচিত হয়েছে তা নয়, দক্ষিণের সমুদ্র থেকে নোনা পানি এসে ঢুকছে নদীগুলোতে; লবণাক্ত হয়ে উঠছে নদীর পানি, আশপাশের জমি।

—এমনি ধারার অসংখ্য দুঃসংবাদ আজ খবরের কাগজ খুললে নিত্যই চোখে পড়ে। আর এমন যে শুধু বাংলাদেশে ঘটছে তা নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে দেশে দেশে দেখা দিচ্ছে ব্যাপক মরুময়তার লক্ষণ। পৃথিবীর স্থলভাগের এক-চতুর্থাংশ হল শুকনো অঞ্চল; তার বেশির ভাগ এলাকাই আজ এমনি মরুময়তার শিকার। দুনিয়াজোড়া জমির উর্বরতা কমছে, পানির সরবরাহে সংকট দেখা দিচ্ছে। তাই জাতিসঙ্ঘ প্রতি বছর ১৭ জুন তারিখকে ঘোষণা করেছে বিশ্ব মরুময়তা দিবস হিসেবে; ১৯৯৫ সালে পালন করা হল এমনি প্রথম মরুময়তা দিবস।

পানি সম্পদ ফুরিয়ে আসছে

মানুষের জীবন আর সভ্যতার সঙ্গে পানির সম্পর্ক একেবারে ওতপ্রোতভাবে গাঁথা। কথায় বলে 'জলই জীবন'। মানুষের দেহের প্রায় ৭০ শতাংশই পানি; শুধু তা নয়, ভূপৃষ্ঠেরও প্রায়

Goto List

৭০ শতাংশ পানিতে ঢাকা। এই পানি আমাদের কাজে লাগে দৈনন্দিন পানীয় হিসেবে, ঘরকন্নার ধোয়ামোছায়, চাষবাসে, শিল্পকারখানার কাজে, মাছ প্রভৃতি খাদ্যের উৎস হিসেবে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, যাতায়াতের প্রয়োজনে। মানুষের সভ্যতায় পানি পালন করেছে এক মুখ্য ভূমিকা; আর সেজন্যই সেই অতি প্রাচীনকাল থেকে জনবসতি আর মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছে নদী, হ্রদ এমনি সব জলপ্রবাহ আর জলাশয়ের তীরে তীরে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন, আমাদের এই পৃথিবীতে মোট পানির পরিমাণ ১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার। তার অবশ্য প্রায় ৯৮ শতাংশই সমুদ্রের নোনা পানি—আয়তনে হবে প্রায় ১৩৭ কোটি ঘন কিলোমিটার। আরো প্রায় ৩ কোটি ঘন কিলোমিটার পানি রয়েছে অ্যান্টার্কটিকা বা দক্ষিণ মেরুর পুরু বরফের স্তূপে আটকা। এরপর কিছু বরফ আছে উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় আর হিমশৈলে—এগুলোও অনেকটা মানুষের নাগালের বাইরে। মানুষ সরাসরি চাষবাস, কলকারখানা বা খাওয়ার জন্য কাজে লাগাতে পারে মাত্রই দু'লাখ ঘন কিলোমিটারের মতো পানি। এগুলো রয়েছে হ্রদে, নদীতে, মাটিতে, হাওয়ায়। কিন্তু এমনি সুপেয় পানির সঞ্চয় সারা পৃথিবী জুড়েই আজ ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসছে।

কিছুটা সেচের কাজে ব্যবহারের জন্য, কিছুটা নানা রকম রাসায়নিক দূষণের কারণে কোথাও পানি যাচ্ছে শুকিয়ে, কোথাও অতিমাত্রায় দূষিত পানি হয়ে উঠছে মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য। উন্নত দেশগুলোতে ব্যাপক আকারে শিল্পায়ন ঘটেছে; সেই সঙ্গে ঘটেছে নদী-হ্রদের ব্যাপক দূষণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে কৃষিতে রাসায়নিক উপাদানের ব্যবহার বহু গুণে বেড়েছে। অন্যদিকে মেরুপ্রদেশের হিমশৈলের আকার কমছে; পর্বতশিখরের বরফের সঞ্চয়ও কমে আসছে। জনবসতির চাপে জলাশয়গুলোকে ক্রমেই আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি। ভূগর্ভের পানির সঞ্চয়ও কৃষি আর নগরের প্রয়োজনে দ্রুত তুলে ফেলা হচ্ছে অর্থাৎ সবটা মিলিয়ে সারা পৃথিবীতে সুপেয় পানির বিপজ্জনক অভাব দেখা দিচ্ছে। আমরা যদি এখনই সতর্ক না হই তাহলে আর কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবী জুড়ে এক ভয়ঙ্কর পানি সংকট দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশ পানি সম্পদের দিক থেকে রীতিমতো ধনবান। এদেশে রয়েছে ছোট-বড় প্রায় সাত শ' নদ-নদী; এক হাজারের ওপর বিল আর হাওর-বাওর; প্রায় লাখ দশেক ছোটখাট পুকুর আর জলাশয়। এসব নদ-নদী-বিল-হাওরে আছে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মাছ; পানির ধারে বাস করে প্রায় ১৫০ প্রজাতির পাখি। কিন্তু নদী, বিল আর পুকুর-জলাশয় যে চিরকাল বেঁচে থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কোথাও প্রাকৃতিক কারণে, কোথাও মানুষের অবহেলায় অনেক পুকুর-দীঘি-হাওর আজ বুঁজে যাচ্ছে; নদী-বিল মরে যাচ্ছে। বাংলাদেশ তার মূল্যবান পানি সম্পদ হারাতে বসেছে।

চলন বিল ধ্বংস হবার পথে

বৃহত্তর পাবনা-রাজশাহীর চলন বিলের দৃষ্টান্ত এখানে দেয়া যায়। এককালে এই বিশাল বিল ছিল অসংখ্য মাছ আর পাখির আবাস। পলি পড়ে আর সেচের খাল কেটে পানি বের করে নেয়ায় সে বিলের বেশির ভাগ আজ বুঁজে গেছে। একদিন যে বিল ছিল হাজার বর্গ

www.banglainternet.com

Goto List

কিলোমিটার আয়তনের এক বিশাল হ্রদ তার আকার কমতে কমতে আজ ২৫ বর্গ কিলোমিটারও হবে কিনা সন্দেহ। আবার বিলের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তারও অনেকখানি এলাকায় পানি থাকে শুধু বছরের খানিকটা সময়। এ এলাকা আজ চাষবাসের অযোগ্য, বিলে আর মাছও পাওয়া যায় না। অধিকাংশ পাখি তল্লাট ছেড়ে উধাও।

আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে ১৭৮৭ সালের পর পুরনো ব্রহ্মপুত্রের স্রোত যখন যমুনার নতুন খাঁড়িতে বইতে শুরু করে তখন সে পানির ধারা গঙ্গার পানির ধারার মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ায়। তাতে করতোয়া আর আত্রাই নদীর (এই দুটো নদী তখন গঙ্গায় গিয়ে পড়ত) মুখে পলি জমতে শুরু করে। তাতে এই দুই নদীর পানি রাজশাহী আর পাবনা জেলার মাঝামাঝি নিচু জায়গায় জমে গিয়ে বিশাল চলন বিলের সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, উনিশ শতকের শেষে এই বিলের আয়তন ছিল এক হাজার বর্গ কিলোমিটারের ওপরে। ইংরেজ আমলে চলন বিল এলাকা যেমন প্রচুর ফসল আর মাছের জন্য বিখ্যাত ছিল তেমনি জলদস্যুদের উৎপাতের জন্য এর অখ্যাতিও ছিল প্রচুর।

কিন্তু তারপর এই বিলে পদ্মা ও অন্যান্য নদীর বয়ে আনা পলি জমতে থাকে। আত্রাই নদী দিনাজপুর আর রাজশাহী জেলার ওপর দিয়ে বয়ে প্রচুর বর্ষার পানি আর তার সঙ্গে পলি এনে চলন বিলে ফেলতে থাকে। বড়াল নদী আনতে থাকে গঙ্গার পানি আর সেই সঙ্গে গঙ্গার বয়ে আনা বিপুল পরিমাণ পলি। বড়াল নদী চলন বিলের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়ে পড়ে যমুনায়। কিন্তু যমুনায় যখন বান ডাকে তখন বড়ালের প্রবাহ যায় থেমে, তখনই পলি পড়তে থাকে সবচেয়ে বেশি। ১৯০৯ সালে এক জরিপ চালিয়ে দেখা যায় বিলের আয়তন হাজার বর্গ কিলোমিটারের ওপর থেকে ক্রমে ক্রমে কমে মাত্র ৩৭০ বর্গ কিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে আবার সারা বছর পানি থাকে মাত্র ৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায়। তখন এই বিলে প্রতি বছর পলি পড়ছিল প্রায় ৪৮ লক্ষ ঘনমিটার হারে; এ হারে পলি পড়লে গত প্রায় আট দশকে পুরো বিলের তলা অন্তত এক মিটার উঁচু হয়ে ওঠার কথা।

এরপর চলন বিল নিয়ে আরো একটা জরিপ করা হয়েছিল ১৯১৩ সালে; তাতে দেখা যায় বিলের এলাকা মাত্র ত্রিশ থেকে চল্লিশ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর থেকে এদেশে জনসংখ্যা অব্যাহত হারে বেড়েছে। বিলের এলাকা যেমন বুঁজে গেছে তেমনি তার চারপাশে গড়ে উঠেছে মানুষের বসতি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলন বিল এলাকার পরিবেশের ওপর যোগ হয়েছে মানুষের অবহেলা আর অত্যাচার। তাতে এই বিলের পরিধি যেমন কেবলই সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে তেমনি এখানকার পরিবেশেরও অবনতি ঘটেছে।

এমনি আরেক বিপর্যয় ঘটেছে বৃহত্তর খুলনা-যশোর জেলার বিল ডাকাতিয়ায়। সত্তরের দশকে নদীতে ত্রুটিপূর্ণ বাঁধ দেবার ফলে বিল ডাকাতিয়ার চারপাশের জমি ক্রমে ক্রমে পলি পড়ে উঁচু হয়ে ওঠে; তাতে এই বিল থেকে বাইরে পানি নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায়। বদ্ধ বিলে গাছপালা মরে পচে বিলের পানি দূষিত হয়ে ওঠে; ক্রমে ক্রমে এই মরা বিলের পানির তলায় ডুবে যায় আশেপাশের প্রায় দেড় শ' বর্গ কিলোমিটার আয়তনের বিশাল এলাকা। তাতে চারপাশের পরিবেশে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, চাষবাস নষ্ট হয়েছে, মানুষের

www.banglainternet.com

Goto List

জীবনে নেমে এসেছে কঠিন বিপর্যয়। চলন বিলের বিপর্যয় ঘটেছে প্রধানত প্রাকৃতিক কারণে যদিও তার মধ্যে মানুষের অমনোযোগ আর অবহেলা রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। কিন্তু বিল ডাকাতিয়ার সমস্যা সম্পূর্ণভাবে মানুষেরই সৃষ্টি।

আমাদের দেশে আরও যে সব নদী আর বিল আছে তাদের ভাগ্যেও এমনি দুর্বিপাক—হয়তো এমনি মৃত্যুর আশংকা—কি আজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ?

আরল হ্রদের বিপর্যয়

পৃথিবীর তিনটি বড় হ্রদ এমন বড় যে, সেগুলো সাগরই বলতে গেলে—শুধু তাদের চারদিক স্থল দিয়ে ঘেরা। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটি সেই কাস্পিয়ান রয়েছে মধ্যএশিয়ায়; দ্বিতীয়টি সুপিরিয়র—আছে উত্তর আমেরিকায়। আর তৃতীয়টি—আরলও রয়েছে মধ্যএশিয়ায়। ১৯৬০ সালে আরলের আয়তন ছিল ২৬,০০০ বর্গমাইল বা প্রায় ৬৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার (বাংলাদেশের অর্ধেকের কাছাকাছি)। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন আরল সাগর আজ ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর তিন দশক পরে হয়তো আরলের অস্তিত্বই থাকবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীতে মানুষের তৈরি এমন বড় ধরনের পরিবেশগত বিপর্যয় এ যাবৎ খুব কমই ঘটেছে।

মধ্যএশিয়ায় কারাকুম আর কিজিলকুম মরুভূমির মাঝখানে বিরাট এক উজ্জ্বল টিপের মতো ঝলমল করত আরল সাগরের স্বচ্ছ নীল পানি। পামির আর তিয়ানশান পর্বতমালা থেকে নেমে এসে মরুভূমির ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে আরলের বুকে গিয়ে পড়ত সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার সবচেয়ে বড় দু'টি নদী আমুদরিয়া আর সিরদরিয়ার প্রাণ জুড়ানো ধারা। আমুদরিয়া পড়েছে আরলের দক্ষিণ প্রান্তে আর সিরদরিয়া উত্তর প্রান্তে। এই দু'টি নদীর ধারে ধারে গড়ে উঠেছে জনপদ। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি তাশখন্দ, সমরখন্দ, বোখারা এই এলাকারই আশেপাশে।

হ্রদের পানিতে একদিন বাস করত বিপুল পরিমাণ মাছ আর অন্যান্য জলজ প্রাণী। ধারে ধারে পানিতে সৃষ্টি হয়েছিল বিপুল নলখাগড়ার বন। হ্রদের তীরে গড়ে উঠেছিল মাছ ধরার বন্দর, দিগন্তজোড়া গোচারণভূমি।

সোভিয়েত বিপ্লবের পর পরই সে দেশের নেতারা স্থির করলেন তাঁদের দেশকে তুলা উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। উজবেকিস্তান আর কাজাখস্তানের লক্ষ লক্ষ হেক্টর তুলার ক্ষেতে আমুদরিয়া আর সিরদরিয়া থেকে সেচের পানি সরবরাহ করা শুরু হয় ১৯১৮ সাল থেকে। তার ফলে ১৯৩৭ সাল নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের চাহিদা মিটিয়ে তুলা বিদেশে রপ্তানি করতে শুরু করে। আর আরলের বিপদের সূত্রপাতও প্রায় তখন থেকেই—যদিও ষাটের দশকের আগে বিপদের রূপটা কেউই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে নি।

আরল সাগর ষাট, সত্তর আর আশির দশকে মধ্য এশিয়ার অর্থনীতিতে বিরাট রূপান্তর আনে। এ সময়ে এ অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল চার গুণ। সারা সোভিয়েত ইউনিয়নের ৯৫ শতাংশ তুলা উৎপন্ন হত এই এলাকায়। ধানের উৎপাদনের ৪০ শতাংশ আর ফল-

www.banglainternet.com

Goto List

ফলারির এক-তৃতীয়াংশও হত এই অঞ্চলে। আরল সাগর এলাকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের শস্য ভাণ্ডার। এসবই সম্ভব হয়েছিল আরল সাগরের আশপাশে ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ফলে। কিন্তু তার জন্য শেষ পর্যন্ত আরলকে বিরাট রকম দাম দিতে হল।

পঞ্চাশের দশকে সোভিয়েত সরকার এই এলাকার কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য আফগানিস্তান আর ইরানের ধার ঘেঁষে বিশাল কারাকুম খাল খনন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুযায়ী ১৯৫৪ সালে প্রায় ১,৩০০ কিলোমিটার লম্বা পৃথিবীর দীর্ঘতম এই খাল খোঁড়ার কাজ শুরু হয়; খালটি চালু হয় ১৯৫৬ সালে। আমুদরিয়া আর সিরদরিয়ার ধারে ধারে জলসেচের জন্য অসংখ্য ছোট ছোট খাল তৈরি করা হয়। তার ফলে এসব নদী থেকে আরল সাগরে যে পানি গিয়ে পড়ত তা ক্রমে ক্রমে কমতে কমতে প্রায় একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। ষাটের দশকের আগে দু'টি নদী দিয়ে প্রতি বছর আরল সাগরে পানি পড়ত প্রায় ৫৫ ঘন কিলোমিটার (১৩ ঘন মাইল)। এই পানি পড়া যখন প্রায় একেবারে বন্ধ হয়ে গেল তখন আরল থেকে কেবল পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যেত লাগল। কিন্তু তা আর পূরণ হবার কোন ব্যবস্থা রইল না। ক্রমে ক্রমে আরল শুকিয়ে উঠতে লাগল।

১৯৬০ সাল থেকে তিন দশকে আরল হ্রদের পানির এলাকা কমে গিয়েছে চল্লিশ শতাংশের ওপরে; পানির উচ্চতা কমেছে তের মিটার। বাকি যে পানি তাতে আছে তা এমন নোনতা হয়ে উঠেছে যে, হ্রদে যেখানে একদিন ২৪ প্রজাতির তরতাজা মাছ খলবল করত সেখানে আজ তার সবই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আরল ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন, আর তিন দশক পর হয়তো আর আরল সাগরের অস্তিত্বও থাকবে না। থাকবে শুধু তার প্রেতাত্মা—ঘন নোনা পানি ভরতি ক'টি ছোট ছোট মরা ডোবা।

শস্যভাণ্ডার থেকে প্রেতপুরী

ষাট সাল পর্যন্ত ব্যাপারটা যে কী ঘটছে তা ঠিকমতো বোঝা যায় নি। কিন্তু তারপর থেকে দেখা গেল ক্রমেই হ্রদের পানি কমে যাচ্ছে। পাড়ে জেগে উঠছে নুনমেশানো বালি। হ্রদের গাছপালা আর মাছ মরে যেতে লাগল। জেলেরা মাছ ধরা জাহাজগুলো বেশ কিছুদিন চালু রাখার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু ক্রমেই পানি সরতে সরতে পুব আর দক্ষিণ দিকে কিনারা থেকে সরে গেল প্রায় এক শ' কিলোমিটার। এখানে ওখানে ডাঙ্গার ওপর পড়ে রইল মাছধরা জাহাজ আর নৌকাগুলো। আগে যেখানে আরলের পানির এলাকা ছিল প্রায় ৭০,০০০ বর্গকিলোমিটার সেখানে এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪০,০০০ বর্গকিলোমিটার। অর্থাৎ প্রায় ৩০,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় জেগেছে নুন ছড়ানো বালির চড়া। এই বালিতে আজকাল প্রায়ই দেখা দেয় ধুলোর ঝড়; লোকের নাকে মুখে চোখে ধুলোর ঝাপটা লেগে সর্বক্ষণ জ্বালা করতে থাকে। এমন অবস্থা যে, ধুলো ঝড়ের সময় চোখ খোলা রাখাই শক্ত। চোখের রোগ, গলার

Goto List

ক্যান্সার পুরো এলাকা জুড়ে বেড়ে উঠেছে। শিশুরা জন্মের পরপরই শ্বাসের রোগে মারা যাচ্ছে পতঙ্গের মতো।

হ্রদের পানি কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকার আবহাওয়া হয়ে উঠেছে রুক্ষ অর্থাৎ গরমের সময় তাপমাত্রা অত্যন্ত চড়ে যায়; শীতের সময় ঠাণ্ডাও পড়ে খুব বেশি। হ্রদের ওপর থেকে মেঘ হয়েছে উধাও—অর্থাৎ বৃষ্টি ঝরছে কম। তার ফলে পশুচারণের জন্য খড়-বিচালির অভাব দেখা দিয়েছে। দারুণ আকাল দেখা দিয়েছে খাবার পানিরও। ময়লা ঘোলা পানি খেয়ে বেশির ভাগ লোকের দেখা দিচ্ছে আন্ত্রিক রোগ। মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে; তারা নানা রকম রোগের শিকার হচ্ছে।

সেচের ব্যবস্থা বিস্তৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে আরেক ধরনের দূষণ। তুলা আর ধানের ফলন বাড়াবার জন্য ব্যাপকভাবে ক্ষেতে সার ও কীটনাশক ছড়ানো হচ্ছে, তাতে মাটি মরে যাচ্ছে আর এসব রাসায়নিক বস্তু মিশে বিষিয়ে উঠছে খাবার পানি। কিছু কিছু কীটনাশকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু চাষীরা ফসল বাড়াবার জন্য মরিয়া হয়ে সে সব নিষিদ্ধ কীটনাশকও ব্যবহার করে চলেছে। বিজ্ঞানীরা মায়ের দুধে মারাত্মক পরিমাণে ডি.ডি.টি. ও অন্যান্য কীটনাশকের হদিস পেয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে বলছেন, আগে আরল সাগরে পানি থাকত মোটামুটি এক হাজার ঘন কিলোমিটার; তা কমতে কমতে হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪০০ ঘন কিলোমিটার। আগে প্রতি বছর আমুদরিয়া আর সিরদরিয়া দিয়ে বয়ে যেত প্রায় এক শ' ঘন কিলোমিটার পানি। তার মধ্যে ৫০ ঘন কিলোমিটার গিয়ে পড়ত আরল সাগরে। হ্রদে বৃষ্টির পানি পড়ত মোটামুটি ১০ ঘন কিলোমিটার অর্থাৎ প্রতি বছর হ্রদে গিয়ে পড়ত মোট ৬০ ঘন কিলোমিটার পানি। আবার প্রতি বছর হ্রদ থেকে বাষ্প হয়ে উড়ে যেত এর সমান পরিমাণ অর্থাৎ প্রায় ৬০ ঘন কিলোমিটার পানি। তাতে হ্রদে পানি সরবরাহের ভারসাম্য বজায় থাকত। কিন্তু সেচের জন্য বাঁধ দিয়ে আর খাল কেটে নদীর পানি আটকে ফেলায় ১৯৭০ সালে আরল সাগরে গিয়ে পড়ে মাত্র ৩৫ ঘন কিলোমিটার পানি; ১৯৮০ সালে পড়ে মাত্র ১০ ঘন কিলোমিটার। আজ কোন কোন বছর আরল সাগরে আর আদৌ কোন পানি গিয়ে পড়ছে না। অথচ তা থেকে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়া থেমে থাকে নি। তার ফলে নষ্ট হয়েছে এই বিশাল হ্রদের পানির ভারসাম্য। আর চারপাশের পরিবেশের ওপর পড়ছে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া।

আরল সাগরকে বাঁচাবার লড়াই

আরল সাগরকে বাঁচাবার কথাও ভাবছেন বিজ্ঞানীরা। সোচ্চার হয়ে উঠেছেন পরিবেশবাদীরা। একটি হ্রদ প্রকৃতির অমূল্য দান। দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যাবে এই হ্রদ—এটা কখনো মেনে নেয়া যায় না। আরল যদি মরে যায় তাহলে ঊষর হয়ে যাবে এই এলাকা। কারাকুম আর কিজিলকুম মরুভূমি ক্রমে ক্রমে গ্রাস করবে আরলের চারপাশ। এত বড় একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন করে হোক ঠেকাতে হবে—আরল হ্রদকে বাঁচাতে হবে।

www.banglainternet.com

Goto List

টনক নড়েছে সরকারেরও। ১৯৮৮ সালে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তুলা চাষের এলাকা কিছুটা কমাতে হবে—যাতে সেচের পানির দরকার কম হয়। খাদ্যশস্যের জন্য এক-তৃতীয়াংশ জায়গা ছাড়তে হবে যাতে ফসলে কিছুটা বৈচিত্র্য আসে। কিছু জমি প্রতি বছর পতিত রাখতে হবে; তাতে এখন যেভাবে অতিচাষের ফলে জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার হাত থেকে জমি বাঁচবে। সেচের পানির বরাদ্দও কমিয়ে দেয়া হয়েছে—যাতে কিছু পানি গিয়ে পড়তে পারে আরল সাগরে।

কিন্তু সেচের পানি কমাতে চাইলেও তা করা মোটেই সহজ নয়। এই এলাকায় গত তিন দশকে গড়ে উঠেছে প্রচুর জনবসতি। চাষের এলাকা বাড়ার ফলে দেশের নানা এলাকা থেকে লোকজন এসেছে এখানে। তাদের রুজি-রোজগার বাঁধা এই এলাকার চাষের সঙ্গে, জলসেচের সঙ্গে। জলসেচ ছাড়া এই মরুভূমির রুক্ষ মাটিতে ফসল ফলাবার কোন উপায় নেই।

জলসেচের পানি যাতে কোনভাবে অপচয় না হয় তার জন্য নানা উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আগে শুধু মাটি কেটে খাল করা হয়েছে; তার নিচ দিয়ে প্রচুর পানি চুঁইয়ে চলে যাচ্ছে মরুভূমির মাটিতে—সেগুলো চাষের বা আর কোন ধরনের কাজে লাগছে না। এখন খালের নিচে আর পাশে প্লাস্টিকের বা কংক্রিটের দেয়াল দেবার কথা হচ্ছে। অনেক জায়গায় সেচের পানি গিয়ে ঢুকছে নানা ডোবা বা জলায়। সেগুলো যাতে আরল সাগরে গিয়ে পড়তে পারে তার চেষ্টা করা হচ্ছে। এসবের ফলে প্রতি বছর ২০ ঘন কিলোমিটার পানি যদি আরলে পড়ে তাহলে তার সঙ্গে বৃষ্টির পানি যোগ হয়ে মোট পানি জমার পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ২৫ থেকে ৩০ ঘন কিলোমিটার। তখন হয়তো তার আকার আজকের চেয়ে আর কমবে না।

কিন্তু আরল সাগর আজ মধ্যএশিয়ার পরিবেশে এক বিশাল ক্ষতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপর উঠছে এমন বিশাল সাদা নুন-ধুলোর ঝড় যে, তা মহাকাশের নভোযান থেকেও দেখা যাচ্ছে। কখনো এই ঝড়ের ঝাপটা ছড়িয়ে পড়ে ৪০০ কিলোমিটার লম্বা আর ৪০ কিলোমিটার চওড়া এলাকা জুড়ে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতি বছর প্রায় সাড়ে চার কোটি টন নুন-বালি উড়ে যাচ্ছে এই ঝড়ের সঙ্গে। আরলের নুন ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে, এমন কি উত্তর মেরু এলাকা পর্যন্ত। এই নুনের পলস্তারা এমন পুরু হয়ে পড়ছে চারপাশের নানা এলাকার ক্ষেতে যে, সে সব জায়গার জমি তাতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তেমনি নষ্ট হচ্ছে পশুচারণের তৃণভূমি। তাতে এই অঞ্চলের পশুসম্পদ কমে যাচ্ছে দ্রুত।

আরলের হ্রদের পানি যত কমবে তত তার পাড়ে জমবে পানি থেকে নুন, আর তত উড়তে থাকবে ধু ধু বালি। নুনের পাড় থেকে নুন-ধুলোর ঝড়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন, আরলের বুকে জমা আছে অন্তত এক শ' কোটি টন নুন; পানি কমার বর্তমান ধারা যদি চলতে থাকে তাহলে এই শতাব্দীর শেষে তার পানি হয়ে দাঁড়াবে সমুদ্রের পানির চেয়ে চার-পাচ গুণ বেশি নোনতা।

www.banglainternet.com

Goto List

প্রকৃতির সঙ্গে মিতালী

আরল সাগরের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ যখন লড়ে, তখন সে লড়াইয়েরও কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। প্রকৃতি তো আসলে মানুষের শত্রু নয়, তার বন্ধু। তাই প্রকৃতির সঙ্গে লড়ার চেয়েও বেশি দরকার মিতালী। প্রকৃতিকে ভাল করে জানতে হবে, বুঝতে হবে তার নিয়ম-কানুন। প্রকৃতির নিয়ম-কানুন মেনে তার সঙ্গে মিতালী গড়ে তুললে প্রকৃতি হয়ে ওঠে মানুষের বন্ধু, তাকে দেয় অঢেল উপহার। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম-কানুন ভালমতো বিচার না করে তার সঙ্গে লড়তে গেলে প্রকৃতি হয়ে উঠতে পারে অতি নিষ্ঠুর, তার নির্দয় আক্রোশ মানুষের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

মধ্যএশিয়ায় যাঁরা খাল খোড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, আমুদরিয়া আর সিরদরিয়ার সব পানি খাল দিয়ে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁরা শুধু ক্ষেতে ফসল বাড়াবার আর লাভের কথাই ভেবেছিলেন; কিন্তু এতে সে এলাকার পরিবেশে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে তার কথা তখন মোটেই ভেবে দেখেন নি। আজ যখন পুরো অবস্থাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন মনে হচ্ছে বুঝি এখন বড্ড বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে!

আজ সবাই আরল সাগরকে রক্ষা করার কথা বলছে। আরল সাগর আজ আর শুধু মধ্যএশিয়ার ক'টি দেশের সমস্যা নয়, সারা পৃথিবীর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা দেশের বড় বড় বিজ্ঞানী আর প্রকৌশলী গবেষণা করছেন কি করে এই হ্রদকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া যায়; অন্তত যাতে এই হ্রদ এখন যতটা আছে তার চেয়ে আর না শুকায় তার ব্যবস্থা নেয়া যায়। দুনিয়ার নানা দেশের বিজ্ঞানী আর পরিবেশবাদীরা ভাবছেন আরল সাগরকে নিয়ে।

আসলে আমাদের চারপাশে প্রকৃতির যা কিছু অবদান তা তো শুধু আমাদের এক প্রজন্মের ভোগের জন্য নয়, আগামী প্রজন্মের মানুষরাও যাতে প্রকৃতির এসব সম্পদ ভোগ করতে পারে তার কথাও আমাদের ভাবতে হবে। কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য আমরা যখন নানা রকম প্রকল্প গ্রহণ করি তখন প্রায়ই আমাদের নজর থাকে শুধু আজকের লাভের দিকে, এসবের ফলে পরিবেশের ওপর কতটা প্রতিক্রিয়া পড়বে, আগামী দিনে কোন ক্ষতি হবে কি না তার কথা আমরা প্রায়ই ভেবে দেখি না।

আরল সাগরের বিপর্যয় সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকতে পারে।

www.banglainternet.com

Goto List

বৈকালকে বাঁচাতে হবে

সারা দুনিয়া জুড়ে যে সুপেয় পানির পরিমাণ কমে যাচ্ছে এটা বিজ্ঞানীদের কাছে আজ এক বিরাট দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা বলছেন, আগামী শতাব্দীতে অধিকাংশ দেশে পানির দারুণ অভাব দেখা দেবে; অন্য সব পানির কথা বাদ দেয়া যাক, শুধু প্রাণ ধারণের জন্য অতি জরুরি খাবার পানির জন্যই হন্যে হয়ে ফিরতে হবে বহু দেশের মানুষকে। অথচ আমরা জানি, আজকের দিনে মানুষের যত রকম অসুখ-বিসুখ তার শতকরা আশিভাগই হয় বিশুদ্ধ পানির অভাবে। কাজেই পানির অভাব দেখা দিলে সারা দুনিয়ায় মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর যে তা বিরূপ প্রভাব ফেলবে তা চোখ বুঁজে বলা যায়।

পানির অভাব হবে—একথা ভাবতে কিন্তু বেশ অবাক লাগে। ডাঙ্গার ওপর আমাদের পৃথিবীটাকে আমরা গাছপালার সবুজ শ্যামলিমায় ঢাকা দেখি বটে, কিন্তু যে সব নভোচর পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদে গেছেন বা মহাকাশে উঠেছেন তাঁরা পৃথিবীকে দেখেছেন নিঃসীম কালো আকাশের মধ্যে একটা সুন্দর নীল রঙের টিপের মতো। এই নীল রঙটা এসেছে পৃথিবীর ওপরকার পানির রঙ থেকে। পৃথিবীর ওপর ডাঙ্গার অংশ মাত্র শতকরা ২৯ ভাগ আর সমুদ্র-হ্রদ-নদী বা পানির অংশ হল ৭১ ভাগ। তাই আমরা স্কুলের ভূগোলের বইতে সাদামাটা হিসেবে পড়ি ভূপৃষ্ঠের চারভাগের মাত্র একভাগ হল স্থল আর তিনভাগই পানিতে ঢাকা।

তবে পৃথিবীতে যে পরিমাণ পানি আছে তার সবটা মানুষের কাজে লাগার মতো নয়। মোট পানির মধ্যে শতকরা ৯৭ ভাগের বেশি রয়েছে সমুদ্রে, সে পানি হল নোনতা অর্থাৎ মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য। দু'ভাগ রয়েছে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় হিমবাহ অথবা মেরু অঞ্চলে হিমশৈল বা ভাসমান বরফের পাহাড় হিসেবে। তারপর যে শতকরা একভাগের মতো বাকি থাকে তারও মাত্র অর্ধেকটা মানুষের নাগালের মধ্যে, বাকিটা রয়েছে মাটির তলায় এমন গভীরে যে, তা তুলে আনা অতি ব্যয়সাধ্য, তাই সে পানি কার্যত আমাদের নাগালের বাইরে।

www.banglainternet.com

Goto List

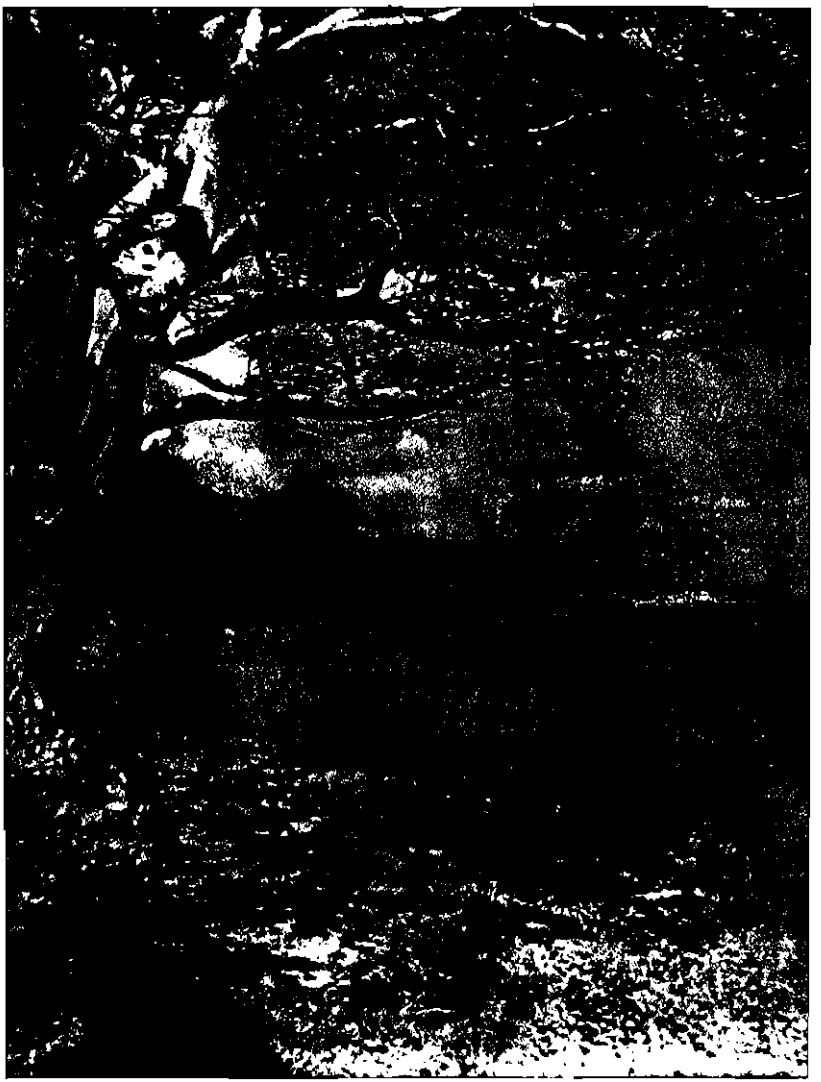

'সাইবেরিয়ার মুক্তা' বৈকাল হ্রদের বুকে জমা রয়েছে
পৃথিবীর মোট মিঠা পানির এক–পঞ্চমাংশ

www.banglainternet.com

Goto List

তাহলে পৃথিবীর সবটুকু পানির মাত্র আধ শতাংশের মতো হল হ্রদ-নদী, খাল-বিল-দীঘি-নলকূপ ইত্যাদি ভূপৃষ্ঠ আর ভূতলের সব পানি মিলিয়ে। কিন্তু মানুষের 'উন্নয়ন'-এর ধাক্কায় এই অতি দরকারি সুপেয় পানির সামান্য ভাণ্ডারে আজ টান পড়তে আরম্ভ করেছে। কল-কারখানা আর পৌরবর্জ্য দূষিত করছে হ্রদ-নদীর পানি, সেচ এবং অন্যান্য কাজের জন্য শুষে তুলে ফেলা হচ্ছে ভূতলের পানি। এমন যে পানির দেশ বাংলাদেশ সেখানেও অনেক জায়গায় এর মধ্যেই খাবার পানির সংকট দেখা দিয়েছে; ভবিষ্যতে এই সংকট হয়তো আরো বাড়তেই থাকবে। আর তাই দুনিয়া জুড়ে পরিবেশ বাঁচানোর আন্দোলনের অংশ হিসেবে পানি আর জলাশয় বাঁচাবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে।

এই আন্দোলনের একটা দৃষ্টান্ত হল বৈকালকে বাঁচাবার আন্দোলন। বৈকাল একটা হ্রদের নাম এ আমরা সবাই জানি— হ্রদটির অবস্থান এশিয়ার মানচিত্রের একেবারে গভীরে, রাশিয়ার দক্ষিণ এলাকায়, মঙ্গোলিয়ার সামান্য একটু উত্তরে।

এক অসাধারণ হ্রদ

বৈকাল একটি হ্রদের নাম শুধু এটুকু বললে বৈকালকে ঠিক বোঝা যায় না। এটি হ্রদ বটে, কিন্তু এমন হ্রদ পৃথিবীতে আর একটিও নেই। এক হিসেবে বৈকাল হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিষ্টি পানির হ্রদ। এটি লম্বায় ৬৩৫ কিলোমিটার, চওড়ায় ৮০ কিলোমিটার; মোট আয়তন প্রায় ৩২,০০০ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজশাহী বা ঢাকা বিভাগের প্রায় সমান এর এলাকা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়; এই হ্রদের গভীরতা হল ১,৬৩৭ মিটার অর্থাৎ এক মাইলের ওপরে। এমন গভীর হ্রদ পৃথিবীতে আর একটিও নেই। তার ফলে এই হ্রদে যে পানি ধরে (২৩,০০০ ঘন কিলোমিটার) তার পরিমাণ আমেরিকার সুপিরিয়র, মিশিগান, হিউরন, ইরি আর অন্টারিও-এই পাঁচটি সবচেয়ে বড় হ্রদ মিলিয়ে যত পানি ধরে তার চাইতেও বেশি। দুনিয়ার সবগুলো নদ-নদী মিলিয়ে সারা বছরে সমুদ্রে যত পানি ঢালে, তার চেয়েও বেশি পানি আছে এই হ্রদে।

আদতে সারা পৃথিবীতে সুপেয় পানির যে ভাণ্ডার তার এক-পঞ্চমাংশই রয়েছে বৈকাল হ্রদের বুকে। আর একদিন কী টলটলে ছিল এই হ্রদের পানি! তাই এর অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য সেদেশের মানুষ বৈকাল হ্রদের নাম রেখেছিল 'সাইবেরিয়ার মুক্তা'; কখনো একে বলা হত 'পবিত্র সাগর'। সে নাম দু'টি এখনও চালু আছে।

তাছাড়া বৈকালের আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এমন পুরনো হ্রদ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদের বয়স হবে বড়জোর দশ হাজার বছর অথচ বৈকালের বয়স অন্তত আড়াই কোটি বছর। এর জন্ম হয়েছে ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে গভীর খাদের ওপর; প্রায় ন' কিলোমিটার গভীর সে খাদ। আর বহু লক্ষ বছর ধরে এর তলায় পরতে পরতে সাত কিলোমিটারের বেশি উঁচু হয়ে জমেছে তলানি। পৃথিবীর ওপরকার ভূত্বকের খোলসটা কতকগুলো টুকরো টুকরো পাতের সমাহারে তৈরি। এমনি তিনটি পাতের কিনারা এই এলাকায় এসে জড়ো হয়েছে। এসব পাতের মধ্যে সব সময় কিছুটা ঠেলাঠেলি টানাপোড়েন

www.banglainternet.com

Goto List

চলছেই, আর তার ফলে এই এলাকায় অনবরত ছোটখাট ভূমিকম্প লেগেই আছে। ব্যাপারটা শুনতে একটু ভয়ের মনে হয়; কিন্তু এজন্যই আবার বিজ্ঞানীদের কাছে ভূতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার জন্য এই হ্রদের এলাকার গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের কত গোপন কথা যে এখানকার এসব তলানির নিচে জমে আছে, তার সব রহস্য উদ্ধার করতে বিজ্ঞানীদের বহু বছর কেটে যাবে।

আর এত পুরনো আর এমন পরিচ্ছন্ন হ্রদ বলেই এর পানিতে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জীবপ্রজাতির বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে অসাধারণ। বহু লক্ষ বছর ধরে এর বুকে এসে পড়ছে ৩৩৬টি নদীর পানির ধারা। আর শীতকালে ওপরের পানি ঠাণ্ডা আর ভারি হয়ে যখন হ্রদের নিচে তলিয়ে যায় তখন তার সঙ্গে একেবারে তলা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায় অক্সিজেন আর পুষ্টি। তাতে পানির ওঠা-নামার ফলে পুষ্টি ওপর-নিচের সব স্তরে সমানভাবে মিশে যেতে পারে। আর তাই আজ এই হ্রদের পানিতে আছে ২,৬০০ প্রজাতির উদ্ভিদ আর প্রাণী; তার মধ্যে ১,৫০০ প্রজাতি হল এমন যাদের পৃথিবীর আর কোথাও দেখা মেলে না। তার মধ্যে পড়ে ৫২ প্রজাতির স্থানীয় মাছ, আর ২৫০ প্রজাতির মিঠা পানির চিংড়ি (বাংলাদেশে মিঠা পানির চিংড়ি আছে মোটামুটি ২৫ প্রজাতির)।

এসব নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ আর প্রাণী বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য প্রকৃতির এক অমূল্য সংগ্রহশালা। আর তাই এই হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ইরখুটস্ক-এ গড়ে উঠেছে একটি মিঠা পানির গবেষণা ইন্সটিটিউট। এখানে বিজ্ঞানীরা হ্রদের পানি প্রবাহ, তলানির হার, জৈব পুষ্টির পরিমাণ, নানা রকম প্লাঙ্কটন, শেওলা, মাছ ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানকার একজন বিজ্ঞানী বলেছেন: মনে করুন আপনি হঠাৎ এমন এক লোকের দেখা পেলেন যার বয়স হয়েছে এক লক্ষ বছর; তাহলে তার কাছে অতীতের কত কথাই না আপনার জানতে ইচ্ছে করবে! দুনিয়ার আর সব হ্রদের তুলনায় বৈকালও বিজ্ঞানীদের কাছে তেমনি। সাধারণত যে কোন হ্রদ দশ লাখ বছরের মধ্যেই তলানি পড়ে বুজে যায়, অথচ এই হ্রদটি টিকে আছে আড়াই কোটি বছর ধরে!

বৈকালের তীরে তীরে আছে বিশাল আকারের বন-বনানী। তাতে আছে পাইন, লার্চ, সেডার এমনি নানা জাতের শীতের দেশের গাছপালা। দুর্গম সাইবেরিয়ার ভেতরে বলে এখানে মানুষের পা পড়েছে অনেক পরে, তাই এখানকার পরিবেশ এখনও তেমন তছনছ হয় নি। এখানে এলে বোঝা যায় এই এলাকার হাওয়া এখনও কলুষে তেমনভাবে ছেয়ে যায় নি, পানি এখনও রয়েছে বিশুদ্ধ; সব কিছু মিলে সারা প্রকৃতিতেই যেন এখানে ছড়ানো এক শুদ্ধতার ছাপ। শুধু বন-বনানীই যে এই এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ তা নয়, এখানে মাটির তলায় আছে লোহা, কয়লা এমনি নানা ধরনের খনিজ।

বৈকালের অনুপম সৌন্দর্যের আকর্ষণে এই দুর্গম এলাকাতেও আজ বহু মানুষ এসে বসত গড়তে আরম্ভ করেছে। বৈকাল-আমুর মেনলাইন (BAM) নামে বিশাল লম্বা (৩,১৪৫ কিলোমিটার) রেলপথ তৈরি শেষ হয়েছে আশির দশকের শেষে; এটি গিয়েছে বৈকালের দক্ষিণ ধার ঘেঁষে। আর হ্রদের প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার উপকূল জুড়ে গড়ে উঠেছে গোটা

www.banglainternet.com

Goto List

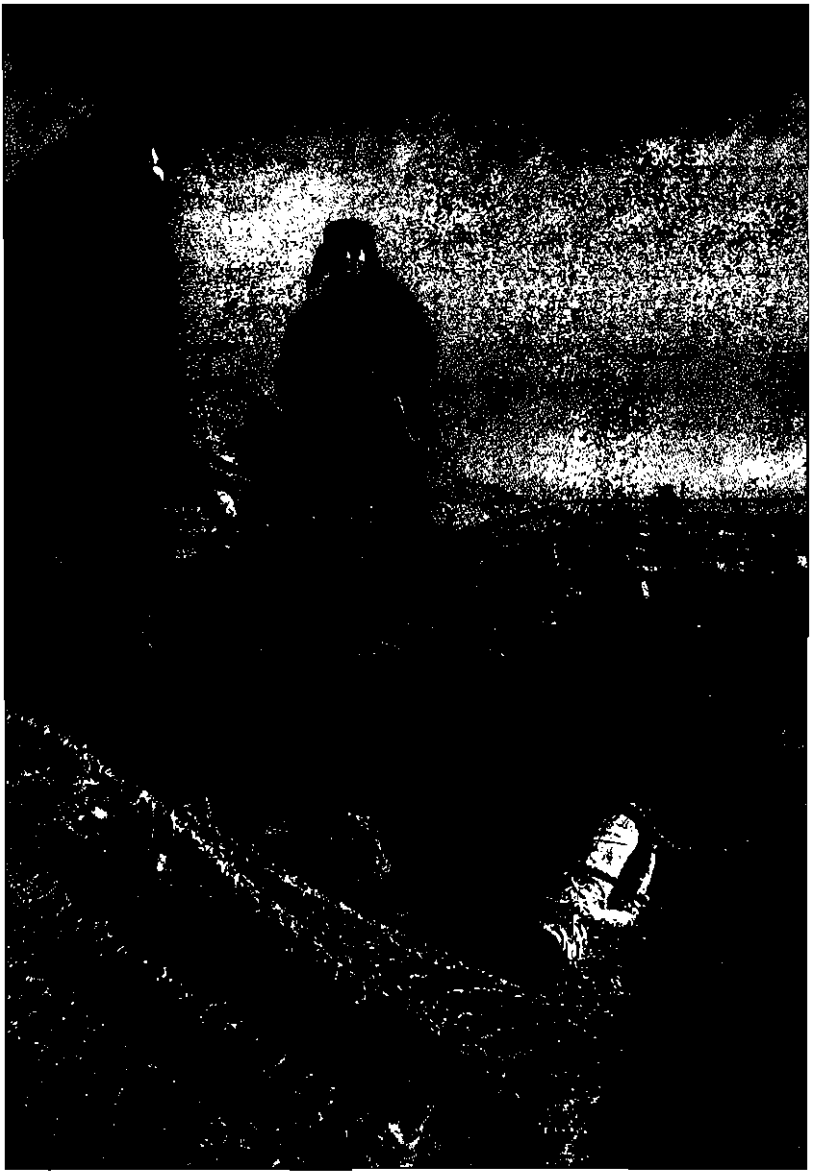

বৈকাল হ্রদে মাছ ধরা: এই হ্রদে এমন ৫২ প্রজাতির মাছ জন্মায় যা আর কোথাও মেলে না

www.banglainternet.com

Goto List

চল্লিশ নগর-জনপদ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আঙ্গারা নদীর মোহনার কাছে ইরকুটস্ক শহরটি; এর লোকসংখ্যা প্রায় সাত লাখ। এ এলাকার বাসিন্দাদের প্রধান পেশা হল মাছ ধরা। অক্টোবর মাস থেকে এখানে শীত নামতে শুরু করে। নভেম্বরেই হ্রদের ওপরের পানি জমে বরফ হয়ে যায়। ডিসেম্বরে তাপমাত্রা নেমে যায় সেলসিয়াস মাপে শূন্যের নিচে ২০ ডিগ্রি। তখন পানির ওপরকার বরফ এক মিটারের বেশি পুরু হয়ে ওঠে। আর তার ওপর দিয়ে অনায়াসে সব ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারে; তাতে দূরের সব শহরের বাসিন্দাদের জন্য রসদ বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

শীতকালে যে এখানকার মানুষেরা বসে থাকে তা নয়। বরফের ফাঁকে ফাঁকে গর্ত করে তার ভেতরে ছিপ ফেলে পাইক, পার্চ, ওমুল (অতি জনপ্রিয় স্থানীয় মাছ) ইত্যাদি মাছ ধরা হয়। নার্পা (Nerpa) নামে এক জাতের স্থানীয় সীল আছে এখানে; তার মোট সংখ্যা প্রায় ৬০,০০০। এর মধ্যে পেশাদার শিকারীদের বছরে প্রায় ৬,০০০ সীল শিকারের অনুমতি দেওয়া হয়। নার্পা সীল লম্বায় হয় প্রায় দেড় মিটার আর তার চর্বিদার থলথলে শরীর ওজনে হয় ১৩০ কেজির মতো অর্থাৎ একজন বয়স্ক মানুষের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ওজনের। এই সীলের মাংস খাওয়া হয়, চর্বিও নানা কাজে লাগে। সচরাচর সীল পাওয়া যায় মেরু অঞ্চলে; উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে প্রায় ৩,২০০ কিলোমিটার দূরে একেবারে বিচ্ছিন্ন এই এলাকায় এ জাতের সীল-এর উদ্ভব কি করে হল সেটা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও এক জটিল রহস্য।

আবার এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে শীত কমে আসে; হ্রদের বরফ কিছুটা করে গলতে শুরু করে। মে মাসে এক সময়ে একটি সন্ধানী বিমান সারা হ্রদের ওপর দিয়ে চক্কর দিয়ে দেখে আসে জাহাজ চালানো নিরাপদ হবে কিনা। তারপর কয়েক শ' জাহাজ বেরিয়ে পড়ে হ্রদের নীল পানিতে। বিরাট বিরাট সামুদ্রিক জাল দিয়ে মাছ ধরা শুরু হয় পুরো দমে। সারা দেশ থেকে অনেক মানুষ আসে বৈকালের সৌন্দর্য উপভোগ করতে। এই এলাকার কিছু ঝরনার পানি অসুখ-বিসুখ ভাল করে দিতে পারে বলে লোকের বিশ্বাস। তাই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায়ও এখানে আসে অনেক লোক।

বৈকালের জন্য বিপদ

'সাইবেরিয়ার মুক্তা'র জন্য আজ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। তার প্রকৃতির সেই আদিম শুদ্ধতা, পবিত্রতা ধরে রাখা ক্রমেই হয়ে উঠছে কঠিন। বৈকালের তীরে তীরে আজ গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে নানা ধরনের শিল্প-কারখানা। ইতোমধ্যে এ রকম কারখানার সংখ্যা দেড়শ' ছাড়িয়ে গিয়েছে। এসব কারখানা থেকে দূষিত পানি এসে পড়ছে হ্রদে; তাতে হ্রদের পানিও দূষিত হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। এই দূষিত পানিতে হ্রদের অনেক উদ্ভিদ আর প্রাণীর অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে সব কারখানা বসানো হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে কাগজের মণ্ড আর সেলুলোজ কারখানাগুলো। এদের জন্য চারপাশের বন থেকে বৃক্ষ নিধন করা হচ্ছে; তার ফলে

www.banglainternet.com

Goto List

এর মধ্যেই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। যে ৩৩৬টি নদী থেকে পানি এসে হ্রদে পড়ত তার প্রায় অর্ধেকের পানি প্রবাহ গত ত্রিশ বছরে কমে গিয়েছে; কিছু একেবারেই শুকিয়ে উঠেছে। মণ্ড আর সেলুলোজের কারখানা থেকে তরল বর্জ্যও নিষ্কাশিত হচ্ছে খুব উঁচু মাত্রায়।

বৈকাল হ্রদের ধারে সেলুলোজ কারখানার ধোঁয়া আর তরল বর্জ্য
বিষাক্ত করে তুলছে এই এলাকার বাতাস আর হ্রদের পানি

এসব কারখানার এক ঘন মিটার তরল বর্জ্য মিশিয়ে দেয়া হয় এক হাজার ঘন মিটার হ্রদের পানিতে; তবু সে পানি এমন বিষাক্ত থেকে যায় যে, তাতে কোন জলজ প্রাণী বাঁচতে পারে না। অথচ একটা বড়সড় মণ্ড বা সেলুলোজ কারখানা থেকেই হয়তো প্রতিদিন হ্রদে ছাড়া হচ্ছে ৩০০,০০০ ঘন মিটার দূষিত বর্জ্য। এই বর্জ্য যে শুধু জলজ উদ্ভিদ আর প্রাণীর জন্যই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে তা নয়, বিপদ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষের জন্যও। দেখা গেছে এই এলাকায় বিভিন্ন জীবের মধ্যে খাদ্যশৃঙ্খলে রয়েছে মোটামুটি পাঁচটি ধাপ। সেগুলো হল এ রকম:

- পানির আণুবীক্ষণিক শেওলা খায় উদ্ভিদভোজী প্রাণীপ্লাঙ্কটন
- সেসব প্রাণীপ্লাঙ্কটন খায় শিকারী প্রাণীপ্লাঙ্কটন
- শিকারী প্রাণীপ্লাঙ্কটনকে খেয়ে ফেলে ছোট ছোট মাছ
- ছোট মাছকে ধরে খায় বড় মাছ কিংবা 'নার্পা' বা বৈকাল সীল
- বড় মাছ আর সীলকে খায় মানুষ।

www.banglainternet.com

Goto List

এমনি খাদ্যশৃঙ্খলের প্রতি স্তরেই বিষাক্ততার মাত্রা ঘনীভূত হয়ে বাড়তে থাকে। অবশেষে এসব বিষাক্তবস্তু যখন মানব দেহে ঢোকে তখন তা মারাত্মকভাবে ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে। আর তা মানুষের নানারকম রোগ, এমন কি মৃত্যুও ঘটাতে পারে। সে দেশের বিজ্ঞানীরা পানিতে নানা বিষাক্ত বস্তুর নিরাপদ মাত্রা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা করেছেন। যেমন দেখা গেছে, ক্যাডমিয়ামের ক্ষেত্রে নিরাপদ মাত্রা প্রতি লিটারে ০.০১ মিলিগ্রাম, অথচ কার্প বা রুইজাতীয় মাছের বেলায় ক্যাডমিয়াম ক্লোরাইড এর এক-দশমাংশ মাত্রাতেও (অর্থাৎ প্রতি লিটারে ০.০০১ মিলিগ্রাম) মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

বৈকালের জন্য আরেক বিপদ হল সেলেঙ্গা নদী; এ নদীটি হ্রদে পড়েছে এর দক্ষিণ-পুব প্রান্তে। হ্রদে প্রতি বছর যত পানি পড়ে তার অর্ধেক বয়ে আসে এই সেলেঙ্গা নদী দিয়ে। বুরিয়াত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের রাজধানী উলান উদে শহরটি হল বৈকাল থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে। এই নগরের পাশ দিয়ে বয়ে আসা সেলেঙ্গা নদী সেই জনপদের শিল্পদূষণ বয়ে নিয়ে এসে ফেলতে আরম্ভ করেছে বৈকাল হ্রদে। এখনই সতর্ক না হলে ভবিষ্যতে এই দূষণ আরো মারাত্মক রূপ নিতে পারে।

এ পর্যন্ত হ্রদের দূষণের মাত্রা দক্ষিণ অঞ্চলেই বেশি। তার কারণ এই এলাকাতেই বেশির ভাগ শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এরপর হ্রদের উত্তর এলাকাতে যদি শিল্প-কারখানা বসানো শুরু হয় তাহলে সেখানেও অনেকটা একই ধরনের দূষণ লক্ষ্য করা যাবে। হ্রদের মাঝখানের পানি এখনও রয়েছে বিশুদ্ধ টলটলে; তবে তা কতদিন থাকতে পারবে বলা শক্ত।

তাছাড়া দূষণ তো শুধু পানিতে ঘটছে না, ঘটছে হাওয়াতেও। দেখা গেছে কারখানার চিমনি থেকে বিষাক্ত ধোঁয়া নিঃসরণের ফলে হ্রদের ওপরকার বাতাসে সালফার বা গন্ধক এবং নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের নিরাপদ মাত্রা এর মধ্যে পেরিয়ে গিয়েছে। তার ফলে হ্রদের পানিতে এবং বৈকালস্ক্ শহরের (এখানেই আছে সবচেয়ে বড় সেলুলোজ কারখানা) কাছাকাছি বনে এর মধ্যে অম্লবৃষ্টি হতে আরম্ভ করেছে। তাতে গাছপালা মরে যাবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

এসব সমস্যা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছেন; সারা দেশে এ নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে। শুধু বৈকালের আশেপাশের এলাকায় নয়, দেশের রাজধানী মস্কো এবং অন্যান্য শহরেও বৈকালকে রক্ষা করার জন্য মিছিল, পদযাত্রা ইত্যাদি হয়েছে। এসব মিছিল থেকে বৈকালের দূষণ বন্ধ করার দাবি জানানো হচ্ছে। এধরনের আন্দোলনের মুখে ১৯৮৬ সালে ইউনেস্কোর উদ্যোগে একটি বৈকাল হ্রদ জীবমণ্ডল সংরক্ষা অঞ্চল গড়ে তোলা হয়। ১৯৮৭ সালের ২ এপ্রিল সোভিয়েত সরকারও বৈকাল হ্রদ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য একটি আইন পাশ করেছেন। হ্রদের কাছাকাছি গাছ কাটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে এখানকার মণ্ড আর সেলুলোজ কারখানাগুলোকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এসব কাজের অগ্রগতি তদারক করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিজ্ঞানীদের প্রতিনিধি নিয়ে একটি বৈকাল কমিশনও নিয়োগ করা হয়েছে। তবে গত ক'বছরে সে দেশে যে অর্থনৈতিক

www.banglainternet.com

Goto List

সংকট চলছে সে কারণে আরো অনেক কিছুর মতোই এই প্রকল্প বাস্তবায়নেও তেমন অগ্রগতি ঘটছে না। আর তাই বৈকালকে রক্ষার জন্য বিজ্ঞানী আর সাধারণ মানুষদের আন্দোলনও থেমে যায় নি।

বিজ্ঞানীরা বৈকাল হ্রদের পরিস্থিতি নিয়ে দেশের মানুষকে বোঝাচ্ছেন, তাদের মধ্যে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। নীতিনির্ধারকদেরকেও বোঝানো হচ্ছে। এর মধ্যে ইরখুটস্কে একদল বিজ্ঞানী প্রতিষ্ঠা করেছেন বৈকাল আন্তর্জাতিক পরিবেশ-গবেষণা কেন্দ্র। বৈকাল হ্রদ নিয়ে গবেষণার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নানা দেশের বিজ্ঞানীরা। বহু দেশের বিজ্ঞানী মিলে আজ বৈকালের পরিবেশের ওপর নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টি রাখছেন।

বৈকাল আজ আর শুধু রুশ দেশের মানুষের বা সে দেশের সরকারের সমস্যা নয়, বৈকাল হয়ে দাঁড়িয়েছে দুনিয়া জোড়া পরিবেশ-সচেতন মানুষের ভাবনার বিষয়। সারা দুনিয়ার মানুষ আজ চাইছে বৈকালকে যে কোন মূল্যে বাঁচাতে হবে। আড়াই কোটি বছরের ইতিহাস আর ঐতিহ্য বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সুপেয় পানির আধার; সেই 'সাইবেরিয়ার মুক্তা' আর 'পবিত্র সাগর'কে কিছুতেই পরিবেশ দূষণের ফলে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে দেওয়া যায় না।

www.banglainternet.com

Goto List

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিষম বিপদ

তেজস্ক্রিয় কথাটা বাংলা ভাষায় চালু হয়েছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে। মানুষ এর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই জানতে পেরেছে মাত্র শ'খানেক বছর হল। এমনিতে বোঝা যায় এ হল এমন এক ধরনের জিনিস যা থেকে বেরোয় তেজোরশ্মি। তবে এ তেজ যেমন তেমন তেজ নয়, অদৃশ্য তেজ যা খালি চোখে দেখা যায় না, আর সচরাচর এ ধরনের শক্তিশালী তেজোরশ্মি বেরোয় বিশেষ জাতের তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে। আমাদের চেনাজানার মধ্যে এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মির সঙ্গে এর কিছুটা তুলনা হয়।

তেজস্ক্রিয় রশ্মির কথা বিশেষ করে শোনা যায় ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকি নামে দু'টি শহরের ওপর আমেরিকা দু'টি পরমাণু-বোমা ফেলার পর। একেকটি বোমার আঘাতের ফলে প্রায় এক লাখ মানুষ মারা যায়; পরে এই সংখ্যা আরো বেশি হয়ে দাঁড়ায়। তার মধ্যে একটা বড় অংশ মারা যায় বিস্ফোরণের পর দীর্ঘকাল ধরে পারমাণবিক রশ্মি বিকিরণের ফলে—ক্যান্সার প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে।

এর বহুদিন পর তেজস্ক্রিয়ার কথা আবার বেশি করে শোনা যায় ১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের কাছাকাছি চরনোবিল পরমাণু-শক্তিকেন্দ্রের একটি 'রিয়্যাক্টর' বা ক্রিয়াকরে আকস্মিক দুর্ঘটনার পর। এই দুর্ঘটনার ফলে তেজস্ক্রিয় ভস্ম বাতাসে ভর করে ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তার পর পর পোল্যান্ড থেকে কিছু গুঁড়ো দুধ আসে চট্টগ্রাম বন্দরে। সেগুলো পরীক্ষা করে দেখা যায় তাতে তেজস্ক্রিয়া রয়েছে অর্থাৎ তা থেকে অদৃশ্য বিকিরণ বেরোচ্ছে। সে দুধ বাংলাদেশের বাজারে বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়। সে সময়ে তেজস্ক্রিয়ার ভয়ে অনেকে দুধ, এমন কি দুধের তৈরি মিষ্টি পর্যন্ত খাওয়া বন্ধ করে দেয়।

এর কিছুদিন পর আবার জানা যায় যে, পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশের জাহাজ বঙ্গোপসাগরে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ ফেলে দিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। পত্র-পত্রিকায় প্রবল লেখালেখি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সে সব জাহাজ সমুদ্রে বর্জ্য না ফেলে চলে যায়। এসব ঘটনায় বাংলাদেশে মানুষের মনে তেজস্ক্রিয়া সম্বন্ধে বেশ কিছুটা কৌতূহল জেগেছে।

www.banglainternet.com

Goto List

তেজস্ক্রিয়া কি?

১৮৯৫ সালে রন্টগেন নামে একজন জার্মান পদার্থবিদ তাঁর পরীক্ষাগারে গবেষণা করতে করতে আকস্মিকভাবে এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কার করেন। উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ বায়ুশূন্য কাচপাত্রে রাখা লক্ষ্যবস্তুর ওপর পড়লে তা থেকে বেরোয় শক্তিশালী অদৃশ্য রশ্মি আর তা ফটোগ্রাফির প্লেটে ছাপ ফেলে। তাছাড়া এই রশ্মি হাতের মাংস ভেদ করে ভেতরের হাড়ের ছবি তুলতে পারে।

তার পরের বছর ফরাসী পদার্থবিদ আঁরি বেকেরেল আবিষ্কার করলেন প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ। তিনি দেখতে পেলেন, ইউরেনিয়াম নামে একটা ধাতুর যৌগ থেকে আপনা আপনি অদৃশ্য রশ্মি বা বিকিরণ বেরোতে থাকে এবং তা এক্স-রশ্মির মতোই ফটোগ্রাফির প্লেটে ছাপ ফেলে। তিনি আরো দেখলেন, এসব বস্তুর বিকিরণ রাসায়নিক বা আর কোন উপায়ে কমানো-বাড়ানো বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এভাবে কোন বস্তু থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকিরণ বেরনোকেই বলা হয় তেজস্ক্রিয়া (Radio-activity) এবং এধরনের বিশেষ গুণযুক্ত বস্তুকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় বস্তু।

এরপর বিজ্ঞানীরা ক্রমে ক্রমে তেজস্ক্রিয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে আরো অনেক কথা জেনেছেন। আজ আমরা জানি যে, আমাদের চারপাশের সব বস্তুই অণু-পরমাণুতে তৈরি। প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে প্রোটন নামে ধনাত্মক বিদ্যুৎ কণিকা; আর তার বাইরে ঘোরে সমান সংখ্যক ঋণাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত ইলেকট্রন কণিকা। হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য সব বস্তুর পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটন ছাড়া বিদ্যুৎহীন নিউট্রন কণিকাও থাকে। এ ধরনের একই প্রোটন সংখ্যা অথচ বিভিন্ন নিউট্রন সংখ্যাযুক্ত পরমাণুকে বলা হয় আইসোটোপ (isotope) বা সমস্থানিক। একই বস্তুর বিভিন্ন আইসোটোপ রাসায়নিক গুণাগুণের দিক দিয়ে একই রকম, তবে তাদের পারমাণবিক ভরে তারতম্য দেখা দেয়।

প্রকৃতিতে ৯২টি মৌলিক পদার্থের প্রায় তিনশ' রকম আইসোটোপ দেখা যায়। এদের মধ্যে গোটা পঞ্চাশ আবার অস্থায়ী আইসোটোপ; অর্থাৎ এদের কেন্দ্র থেকে আলফা, বিটা, গামা এই তিন ধরনের বিকিরণ নিঃসরণের মাধ্যমে এরা ক্রমে ক্রমে অন্য মৌলিক পদার্থে বা অন্য আইসোটোপে পরিণত হয়। এছাড়া পারমাণবিক বিস্ফোরণে আরো দেড় হাজারের মতো কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সৃষ্টি হতে পারে।

বেকেরেলের পর প্যারি-প্রবাসী পোল বিজ্ঞানী মারি কুরী ও তাঁর স্বামী পিয়ের কুরী আবিষ্কার করেন যে, ইউরেনিয়াম মৌল থেকে রশ্মি বিকিরণের ফলে সেটা আরো বেশি তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়াম মৌলে পরিণত হয়, আর তৈরি হয় তার চেয়েও বেশি তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম। এসব বস্তুর এভাবে আপনা আপনি রশ্মি বিকিরণ করার গুণকে মারি কুরীই নাম দেন রেডিও-অ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা। এই আবিষ্কারের জন্য বেকেরেল ও কুরী দম্পতি একযোগে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান ১৯০৩ সালে। কুরী-দম্পতিকে এসব বস্তুর রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য এরপর আরো একবার নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় রসায়ন শাস্ত্রে —সেটা ১৯১১ সালে।

www.banglainternet.com

Goto List

তেজস্ক্রিয় বস্তুর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার অর্ধায়ু। ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ করতে করতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সক্রিয়তা কমতে থাকে। যে সময়ে একটি তেজস্ক্রিয় বস্তুর সক্রিয়তা স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের মাধ্যমে হ্রাস পেয়ে পূর্বমাত্রার অর্ধেকে পৌঁছায় তাকে তার 'অর্ধায়ু' বলা হয়। প্রতিটি তেজস্ক্রিয় বস্তুর নিজস্ব বিশিষ্ট অর্ধায়ুর সাহায্যে তাকে সহজেই সনাক্ত করা যায়। কোনো কোনো তেজস্ক্রিয় বস্তুর অর্ধায়ু এক সেকেন্ডের লক্ষ ভাগের একভাগ হতে পারে, আবার আর কোনো বস্তুর বহু কোটি বছরও হতে পারে।

মানব কল্যাণে তেজস্ক্রিয়া

গত প্রায় এক শ' বছরে তেজস্ক্রিয়া সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে। জানা গিয়েছে, এসব তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে বিকীর্ণ রশ্মি যেমন মানুষের নানা উপকারে লাগে তেমনি এ থেকে আমাদের দেহে নানা ধরনের মারাত্মক ক্ষতিও হতে পারে। প্রায়শ এসব ক্ষতি হয় মানুষের অজ্ঞতার কারণে, অনেক সময় অবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহারের ফলে।

এই শতকের শুরুতে তেজস্ক্রিয় রেডিয়ামের একটি প্রাথমিক ব্যবহার হয় ক্যান্সারের চিকিৎসায়। তারপর তেজস্ক্রিয়ার আরো নানা ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়েছে। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় পৃথিবীর প্রায় সব হাসপাতালেই আজ এর ব্যবহার হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে নতুন নতুন জাতের ফসল উদ্ভাবনে ও ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দমনে তেজস্ক্রিয়ার অবদান রয়েছে প্রচুর। খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করতে, ওষুধপত্র ও শল্য চিকিৎসার সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত করতে, শিল্প উৎপাদন, ভূ-বিদ্যা, জলবিদ্যা ও আরো নানা ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়ার ব্যাপক ও বহুমুখী ব্যবহার আজ বিস্তৃত হয়েছে।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পরমাণু-শক্তিকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনো কোনো দেশে (যেমন ফ্রান্স ও সুইডেন) মোট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি বর্তমানে পরমাণু-শক্তি থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। এসব পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র থেকে পরিবেশে নানা কারণে কিছু কিছু তেজস্ক্রিয়া বিমুক্ত হয়। পারমাণবিক খনিজ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পারমাণবিক চুল্লিতে ব্যবহৃত জ্বালানি শোধন ইত্যাদির মাধ্যমেও বেশ কিছু তেজস্ক্রিয়া নির্গত হচ্ছে।

পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণকালে বা পারমাণবিক চুল্লিতে পারমাণবিক ভাঙ্গনের ফলে নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হয়ে থাকে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটলে এসব তেজস্ক্রিয় বস্তু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। পারমাণবিক চুল্লিতে এগুলো সচরাচর চুল্লির কেন্দ্রবস্তুতে জমানো থাকে। কোন কারণে চুল্লির কেন্দ্র ভেঙ্গে বা গলে গেলে সেখান থেকে এসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ চারপাশের পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তার ফলে আশপাশের মাটি, পানি, বাতাস ও গাছপালা, দালানকোঠা সবকিছু তেজস্ক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পরিবেশে মারাত্মক দূষণ ঘটাতে পারে।

www.banglainternet.com

Goto List

তেজস্ক্রিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব

পারমাণবিক ক্রিয়াকরে চরনোবিলের মতো মারাত্মক ধরনের দুর্ঘটনা পৃথিবীতে এযাবৎ কমই হয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় এযাবৎ পৃথিবীতে কয়েক হাজার পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। এসব বিস্ফোরণ ভূপৃষ্ঠে, আকাশে, সমুদ্রের তলায়, ভূগর্ভে প্রভৃতি নানাভাবে করা হয়েছে। বিশেষ করে ভূপৃষ্ঠে, আকাশে বা সমুদ্রের তলায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটলে পরিবেশে বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মোটামুটি দু'লাখ লোকের মৃত্যু ঘটলেও তেজস্ক্রিয়ার প্রভাবে আরো বহু লক্ষ লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে এদের চিকিৎসা চালাতে হয়। এসব চিকিৎসা চালাতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রিয়ার ফলাফল সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পেরেছেন।

তেজস্ক্রিয় বস্তুর কেন্দ্র থেকে যেসব রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় তার মধ্যে এক জাতের নাম হল আলফা রশ্মি; এগুলো এক ধরনের পারমাণবিক কণিক—দু'টি প্রোটন ও দু'টি নিউট্রনযুক্ত হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু। এদের ভর বেশি, বেগ কম; তাই পাতলা একখণ্ড কাগজ দিয়েই আলফা রশ্মিকে ঠেকানো যায়। বিটা রশ্মি হল ইলেকট্রন কণিকা; সব ধরনের পরমাণু-কেন্দ্রের চারপাশে এসব ঋণাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত ইলেকট্রন কণিকা ঘুরপাক খায়। ইলেকট্রন কণিকারা হতে পারে প্রচণ্ড বেগসম্পন্ন। এরা মানুষের গায়ের চামড়া ভেদ করে যেতে পারে। গামা রশ্মি হল রঞ্জন-রশ্মির চেয়ে শক্তিশালী অতি-হ্রস্বমাপের বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ (দৃশ্য আলো এদের চেয়ে লম্বা মাপের তরঙ্গ, বেতার তরঙ্গ আরো বড় মাপের তরঙ্গ)। এদের ঠেকানো যায় পুরু সীসার পাত বা খুব চওড়া কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে।

তেজস্ক্রিয় বস্তুর কেন্দ্র থেকে যেসব তেজোরশ্মি বেরোয় সেগুলো অন্য পরমাণুর গায়ে পড়ে তার খোলস থেকে একটি দু'টি ইলেকট্রন কণিকা ছিটকে বের করে দিতে পারে। এভাবে ইলেকট্রন হারিয়ে পরমাণুটি তখন হয়ে পড়ে ধনাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত; তাকে বলা হয় আয়ন। ছিটকে বেরনো ইলেকট্রন নিজেও একটি আয়ন। এমনি ইলেকট্রন অন্য পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকেও করে তোলে ঋণাত্মক আয়ন। অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে একেকটি রশ্মি বিকিরণ চারপাশের বস্তুতে একজোড়া করে আয়ন সৃষ্টি করতে পারে—তাদের একটি ঋণাত্মক, অন্যটি ধনাত্মক : সেজন্য এসব বিকিরণকে আয়নসৃষ্টিকারী বিকিরণও বলা হয়।

কোন আয়নসৃষ্টিকারী বিকিরণ মানুষের দেহকোষে, বিশেষ করে জননকোষে, রক্তসৃষ্টিকারী অস্থিমজ্জাকোষে এবং শিশুদের বর্ধিষ্ণু অঙ্গের কোষে নানা ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে। বিকিরণের ফলে জীবদেহের অণু-পরমাণুর বাঁধুনিতে বিপর্যয় ঘটে এবং তার বৈদ্যুতিক স্থিতাবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। তাতে সেই কোষের মৃত্যু হয় বা বিকৃতি ঘটে এবং দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। শক্তিশালী বিকিরণ তাৎক্ষণিকভাবে স্নায়ুতন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্রে বিপর্যয় ঘটায়, তাই তার প্রভাব সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায়; কিন্তু কম মাত্রার বিকিরণেও দীর্ঘকালীন প্রভাব হিসেবে জিনগত পরিবর্তন বা ক্যান্সার সৃষ্টির আশংকা থাকে।

www.banglainternet.com

Goto List

তেজস্ক্রিয়ার পরিমাপ

মানুষের দেহে কতখানি বিকিরণপাত ঘটছে এবং তাতে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে, সেটা বোঝার জন্য তেজস্ক্রিয়ার পরিমাপের একটা মানদণ্ড থাকা দরকার। এ ধরনের একটি প্রাথমিক মাত্রা হল নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বস্তুতে একক সময়ে কতগুলো করে পরমাণু ভেঙ্গে যাচ্ছে তার হিসেব। কোনো বস্তুতে যদি প্রতি সেকেণ্ডে একটি পরমাণু ভাঙ্গতে থাকে তাহলে তাকে এক বেকেরেল পরিমাণ তেজস্ক্রিয়া বলে ধরা হয় (তেজস্ক্রিয়ার আবিষ্কারক আঁরি বেকেরেলের নামে এই নাম)। এ ধরনের আরেকটি পুরনো একক হল কুরী। এক কুরী ৩,৭০০ কোটি বেকেরেলের সমান। তেজস্ক্রিয়ার পরিমাপের জন্য আজকাল সচরাচর বেকেরেল বা কুরী একক আর ব্যবহৃত হয় না।

তেজস্ক্রিয় পরিমাপের আরেকটি মানদণ্ড হল জীবদেহে কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়া শোষিত হচ্ছে তার মাত্রা স্থির করা। প্রতি কিলোগ্রাম দেহবস্তুতে যদি এক 'জুল' (joule) পরিমাণ তেজস্ক্রিয় শক্তি শোষিত হয় তাহলে তাকে ধরা হয় এক গ্রে (gray, সংক্ষেপে Gy)। একজন ব্রিটিশ পরমাণু-বিজ্ঞানীর নামে এই নামকরণ। এ ধরনের একটি পুরনো একক হল র‍্যাড (rad); এক র‍্যাড এক গ্রে-র শতাংশের সমান অর্থাৎ ১০০ র‍্যাড-এ এক গ্রে।

মানুষের দেহের জন্য আজকাল বহুল ব্যবহৃত আরেকটি একক হল সীভার্ট [sievert, সংক্ষেপে Sv)। তেজস্ক্রিয়া দেহের শোষকলার যে ক্ষতি সাধন করে তার পরিমাপ এই এককের ভিত্তি। এ ধরনের একটি পুরনো একক হল 'রেম' (rem)। এক সীভার্ট ১০০ রেম-এর সমান।

উল্লেখ্য যে, একই পরিমাণ বিকিরণ পড়লেও সব বস্তুতে সমান ক্ষতি হয় না। যেমন এক সীভার্ট বিকিরণপাতের ফলে এক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) লোকের মধ্যে মোটামুটি ১৬৫ জন পরবর্তীকালে মারাত্মক ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। রঞ্জন-রশ্মি, গামা রশ্মি আর বিটা রশ্মির ক্ষেত্রে গ্রে আর সীভার্ট-এর মাপ হয় একই। তবে একই পরিমাণ আলফা রশ্মি দেহের মধ্যে প্রবেশ করলে কোষকলার দারুণ ক্ষতি করে; তাই আলফা কণার ক্ষেত্রে সীভার্ট-এর মান গ্রে-র চেয়ে বিশগুণ বেশি। মেট্রিক পদ্ধতির পরিমাপের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এসব এককের সহস্রাংশ বোঝাতে 'মিলি', সহস্র গুণ বোঝাতে 'কিলো' প্রভৃতি শব্দ যোগ করা হয়; অর্থাৎ 'মিলিসীভার্ট' এক সীভার্ট-এর সহস্রাংশ, 'কিলোসীভার্ট' এক সীভার্ট-এর সহস্র গুণ।

সাধারণত পরিবেশ থেকে একজন মানুষের দেহে বছরে গড়পড়তা ০.২ রেম (বা এক সীভার্টের ২ সহস্রাংশে) বিকিরণপাত ঘটে। এতে মানুষের ক্যান্সার হবার আশংকা সামান্য— দশ দিনে একটি করে সিগারেট খাবার মতো। অথচ কারো দেহে যদি কয়েক মিনিটের মধ্যে ১০০ সীভার্ট বিকিরণপাত হয় তাহলে তার নির্ঘাৎ মৃত্যু ঘটবে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটলে নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় পরমাণু চারপাশের পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কারো কারো প্রভাব ক্ষণস্থায়ী (অর্থাৎ অর্ধায়ু কম), কারো প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী,

www.banglainternet.com

Goto List

(অর্ধায়ু বেশি)। ১৯৮৬ সালে চরনোবিল পরমাণু-শক্তিকেন্দ্রের দুর্ঘটনায় ইউরোপের নানা দেশে মাঠ-ঘাটের ঘাসে আয়োডিন-১৩১ নামে একটি তেজস্ক্রিয় বস্তু ছড়িয়ে পড়ে। সেসব দেশে গরু যখন ঘাস খায় তখন তার সঙ্গে তেজস্ক্রিয়া ঢোকে গরুর দুধে। আয়োডিন-১৩১-এর অর্ধায়ু মাত্র আট দিন অর্থাৎ এই তেজস্ক্রিয় বস্তু'র অর্ধেক তেজ নিঃশেষ হয় আট দিনে; তারপর যে তেজ বাকি থাকে তারও অর্ধেক নিঃশেষ হয় এর পরের আট দিনে। এভাবে মাসখানেকের মধ্যেই আয়োডিন-১৩১-এর বিকিরণ তেজ বহুগুণে কমে যায়। তবে এই তেজস্ক্রিয় আয়োডিন-১৩১ থাইরয়েড গ্রন্থিতে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।

এছাড়া পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে আরেকটি তেজস্ক্রিয় বস্তু চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে, তার নাম সিজিয়াম-১৩৭। এর অর্ধায়ু প্রায় ত্রিশ বছর অর্থাৎ তেজ বিকিরণ করতে করতে এর তেজ কমে অর্ধেক হয় ত্রিশ বছরে; এক-চতুর্থাংশ হতে কেটে যায় প্রায় ষাট বছর; মৌল হিসেবে সিজিয়ামের চরিত্র অনেকটা পটাসিয়ামের মতো। পটাসিয়াম আমাদের দেহের জন্য একটি অত্যন্ত দরকারি মৌল। দেহের নরম কোষকলায় আছে যথেষ্ট পরিমাণে পটাসিয়াম। কাজেই খাবারের সঙ্গে সিজিয়াম-১৩৭ দেহে ঢুকলে তা পটাসিয়ামের স্থান দখল করে দেহের সব নরম কোষকলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটিয়ে কোষকলা ধ্বংস করতে থাকে। চরনোবিল দুর্ঘটনার পর পর বিশেষ করে সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানিতে খাবার দুধে উচ্চমাত্রায় সিজিয়াম-১৩৭-এর হদিস পাওয়া যায় (প্রতি লিটারে ৩০০ বেকেরেলের ওপরে)।

এ ধরনের পরিস্থিতি মানুষকে এর আগে আর কখনো মোকাবিলা করতে হয় নি, তাই তেজস্ক্রিয়ার নিরাপদ মাত্রা নিয়েও সারা দুনিয়ায় বিতর্কের ঝড় ওঠে। নানা দেশের ও নানা বিশেষজ্ঞের নির্ধারিত নিরাপদ মাত্রার মধ্যে বেশ খানিকটা গরমিল দেখতে পাওয়া যায়।

১৯২৮ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক বিকিরণ নিরাপত্তা কমিশন (International Commission on Radiological Protection, সংক্ষেপে ICRP) গঠিত হয়েছিল। এই সংস্থা বিকিরণ সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত পেশাজীবী ও জনসাধারণের জন্য নিরাপদ বিকিরণমাত্রা এবং বিকিরণ উৎসের নিরাপদ স্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ ও নির্দেশনা দিয়ে থাকে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এসব সুপারিশ ও নির্দেশনা পর্যায়ক্রমে সংশোধনও করা হয়।

আন্তর্জাতিক বিকিরণ নিরাপত্তা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী একজন সাধারণ মানুষের দেহে পরিবেশগত বিকিরণের বাইরে সারা জীবনে ৫ রেম-এর বেশি বিকিরণ পড়া উচিত নয়। এই পাঁচ রেম (অর্থাৎ ৫,০০০ মিলিরেম) বিকিরণ ৫০ মিলিসীভার্ট বিকিরণের সমান। এই পরিমাণ বিকিরণ যদি কারো দেহে ৫০ বছরে পড়ে তাহলে প্রতি বছর পড়ার হার হয় গড়ে মাত্র এক মিলিসীভার্ট। এই মাত্রা বাংলাদেশের গড় পরিপার্শ্বিক বিকিরণের মোটামুটি অর্ধেক। পারমাণবিক স্থাপনা বা বিকিরণ সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে নিরাপদ যাত্রা নির্ধারিত হয়েছে বছরে ২০ মিলিসীভার্ট অর্থাৎ সর্বসাধারণের মাত্রার বিশগুণ।

www.banglainternet.com

Goto List

মানুষের দেহে যে তেজস্ক্রিয়া এসে পড়ে তা আসে সাধারণত দু'ধরনের উৎস থেকে: (ক) প্রাকৃতিক উৎস ও (খ) কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় বস্তু। জীবদেহে তেজস্ক্রিয়া পড়ে বেশির ভাগই প্রাকৃতিক উৎস থেকে। এর প্রায় সবই তৈরি হয়েছে সৃষ্টির সেই আদিতে। তাদের মধ্যে কম অর্ধায়ুবিশিষ্ট যেসব তেজস্ক্রিয় বস্তু তা অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়েছে; দীর্ঘ অর্ধায়ু বিশিষ্ট তেজস্ক্রিয় বস্তুগুলি আমাদের চারপাশের পরিবেশে টিকে রয়েছে।

প্রকৃতিতে সৃষ্টির আদি থেকে রয়েছে বেশ কিছু তেজস্ক্রিয় উপাদান। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে পটাসিয়াম-৪০, রুবিডিয়াম-৮৭, ল্যানথানাম-১৩৮, সামারিয়াম-১৪৭, লিউটিয়াম-১৭৬ ও রেনিয়াম-১৮৭। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে আবার তেজস্ক্রিয় উপাদান খনিজ হিসেবে বা কিছুটা ঘনীভূত অবস্থাতেও পাওয়া যায়। তার মধ্যে ভারতের কেরালা রাজ্য, ব্রাজিলের সমুদ্রতট, বাংলাদেশের কক্সবাজার সৈকত অঞ্চল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য এসব অঞ্চলে বসবাসকারীদের দেহে স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের তুলনায় বেশি তেজস্ক্রিয়া সম্পাত ঘটে থাকে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে তেজস্ক্রিয়া দেখা দেয় সেসব ছাড়া মহাকাশ থেকেও নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় বস্তু ক্রমাগত পৃথিবীর ওপর এসে পড়ছে। এদের বলা হয় কসমিক-রে (cosmic ray) বা মহাজাগতিক রশ্মি। এই মহাজাগতিক রশ্মি কয়েক ধরনের অতি শক্তিশালী কণিকা ও বিকিরণের সমন্বয়ে তৈরি। এদের সম্বন্ধে অনেক কথা বিজ্ঞানীদের এখনও জানা বাকি রয়েছে; তবে ধারণা করা হয় মূলত মহাকাশে নানা ধরনের বস্তু ও তেজকণার সংঘর্ষ ও বিস্ফোরণ থেকেই এসবের উৎপত্তি।

পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ

এসব আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যেসব কারণে পরিবেশে বিকিরণ দেখা দিতে পারে তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে (ক) পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ও পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, (খ) পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা, (গ) পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র থেকে নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থ এবং (ঘ) পরিবেশের স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়া।

এর মধ্যে স্বভাবতই প্রথম ও দ্বিতীয়টিই মানুষের জন্য সবচাইতে ব্যাপক ও ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এবং ১৯৮৬ সালে চরনোবিলের পরমাণু-শক্তিকেন্দ্রে সংঘটিত ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু-বোমা পড়ার পর যে দু'লাখের ওপর লোক নিহত হয় তাদের অধিকাংশের মৃত্যুর কারণ বিস্ফোরণজনিত ধ্বংসকাণ্ড ও অগ্নিকাণ্ড; কিন্তু প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যু ঘটে তীব্র তেজস্ক্রিয়ার কারণে। এ বিষয়ে পল কেলার নামে মার্কিন সামরিক বাহিনীর একজন চিকিৎসক আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকার ৮ জুন ১৯৪৬ সংখ্যায় প্রথম বিবরণ প্রকাশ করেন। ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ২১ জন রোগীর ওপর ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তাঁর এই বিবরণটি লেখা।

www.banglainternet.com

Goto List

এই ২১ জন রোগীর মধ্যে ১৭ জন বিভিন্ন ধরনের ভবনের মধ্যে অবস্থান করছিল। তাদের মধ্যে একজন বলে যে, বিস্ফোরণের ধাক্কায় তার কাঠের বাড়ি ধসে যায় এবং সে প্রায় বার ফুট দূরে ছিটকে পড়ে। বিস্ফোরণের পাঁচ দিনের মধ্যে এদের সবারই ক্ষুধামান্দ্য, বমিভাব ও বমির লক্ষণ দেখা দেয়। তাদের মধ্যে অর্ধেকের শরীরের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায়। একুশ জনের মধ্যে ১৩ জনের মাথার চুল ব্যাপকভাবে পড়ে যেতে আরম্ভ করে; একজনের চোখের ভ্রূ ও আরেকজনের দাড়িও খসে পড়তে থাকে।

এই রোগীদের মধ্যে ১১ জনের ব্যাপকভাবে রক্তপাতের লক্ষণ দেখা দেয়; কারো রক্তপাত হতে থাকে দাঁতের মাড়ি থেকে, কারো চামড়ার নিচে, কারো বা নাক বা গলা থেকে। প্রায় সব রোগীই প্রচণ্ড রকম দুর্বলতা বোধ করতে থাকে। কারো কারো ডায়রিয়া, মাথা ঘোরানো, কোন কিছু গিলতে অসুবিধা, অস্বাভাবিক তৃষ্ণা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। এদের রক্ত পরীক্ষা করে তাতেও গুরুতর অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে। তার মধ্যে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যার হ্রাস ছিল সবচেয়ে নাটকীয়। সাধারণভাবে রক্তশূন্যতাও ছিল অত্যন্ত ব্যাপক।

আশির দশকের শেষে জাপানে এক ব্যাপক জরিপ চালিয়ে দেখা যায় যে, হিরোশিমায় বিকিরণগ্রস্ত ও প্রথম পাঁচ মাসে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা মোটামুটি দেড় লক্ষ; হিরোশিমায় অনুরূপ ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ৮০,০০০। দু'টি শহর মিলে তেজস্ক্রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির মোট সংখ্যা সাড়ে তিন লাখের ওপরে। এসব ব্যক্তির মধ্যে যারা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায় তাদেরও অনেকের চোখের ছানি, রক্তের ক্যান্সার, থাইরয়েড গ্রন্থির প্রদাহ, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্যান্সার প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়।

জীবদেহে বিকিরণের প্রতিক্রিয়া

হিরোশিমা-নাগাসাকির অভিজ্ঞতার পর গত কয়েক দশকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিকিরণের প্রভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আরো বেড়েছে। এর মধ্যে পৃথিবীতে এক হাজারের ওপর পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন বিকিরণের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াও ক্রমেই বেশি মারাত্মক হয়ে ওঠে। তাছাড়া দেহের কোন্ অংশের ওপর বিকিরণপাত ঘটছে তার ওপরও বিকিরণের প্রভাব অনেকখানি নির্ভর করে। গামা রশ্মির চেয়ে নিউট্রন রশ্মির প্রতিক্রিয়া বেশি মারাত্মক হয়। আবার হাত-পায়ের ওপর বিকিরণ পড়ার তুলনায় সমগ্র দেহে বা পেটে বিকিরণপাত ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া বেশি ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

বিকিরণের ফলে দেহের যেসব অঙ্গের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় তার মধ্যে রয়েছে মস্তিষ্ক ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও অস্থিমজ্জা। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে দ্রুত খিঁচুনি দেখা দিতে পারে, রোগী চেতনা হারাতে পারে এবং মৃত্যু ঘটতে পারে। পরিপাকতন্ত্রে বিকিরণের প্রভাবে পাকস্থলীর ভেতরের ঝিল্লীস্তর নষ্ট হয়ে যায় এবং তার ফলে ক্ষুধামান্দ্য,

www.banglainternet.com

Goto List

বমি, ডায়রিয়া, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। ডায়রিয়া গুরুতর হলে তার সঙ্গে রক্তপাত হতে থাকে; শুষ্কতার ফলে রক্ত চলাচলে সঙ্কট দেখা দেয় এবং মৃত্যু ঘটে।

রক্তে শ্বেত রক্তকণিকা হ্রাসও বিকিরণের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। বেশি বিকিরণপাত ঘটলে রক্তকণিকা উৎপাদনের কেন্দ্র অস্থিমজ্জা বিনষ্ট হয়ে যায়; তার ফলে দ্রুত রক্তশূন্যতা ঘটতে থাকে, বিশেষ করে যদি পাকস্থলী থেকে রক্তপাত ঘটতে থাকে তাহলে রক্তশূন্যতা আরো তাড়াতাড়ি হয়। দীর্ঘদিনের চিকিৎসার ফলে অনেক রোগী এ ধরনের সঙ্কট থেকে মুক্ত হতে পারে; তবে অধিকাংশই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

বিকিরণের পরিমাণ অনুযায়ী অসুস্থ ব্যক্তিদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ফেলা যায়। যাদের সারা দেহে বিকিরণপাতের পরিমাণ ৫০ গ্রে (৫,০০০ র‍্যাড)-এর ওপরে তাদের সাধারণত ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটে। এর চেয়ে কিছুটা কম অথচ মারাত্মক তেজস্ক্রিয়ায় আক্রান্ত হলে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রবল বমি, ডায়রিয়া, জ্বর, শুষ্কতা ও সংজ্ঞা হারানোর লক্ষণ দেখা দেয়; তার ফলে তাদের কয়েক দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। কেউ কেউ প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় তেমন কাবু না হলেও চার-পাঁচ দিনের মধ্যে গুরুতর পাকাস্ত্রিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়। এরাও কয়েক দিনের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এ ধরনের মারাত্মক তেজস্ক্রিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার কোন উপায় উদ্ভাবন করা এখনও সম্ভব হয় নি।

দ্বিতীয় দলে পড়ে এমন সব ব্যক্তি যাদের ওপর মোটামুটি ৫ থেকে ২০ গ্রে (৫০০-২,০০০ র‍্যাড) বিকিরণপাত ঘটেছে। এদের ওপর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয় ক্ষুধামান্দ্য, বমিভাব, বমি, ঘাম, দুর্বলতা ও চলচ্ছক্তিহীনতা। দু'একদিন পর এই অসুস্তার ধাক্কা কাটিয়ে এরা দু'এক সপ্তাহ কিছুটা সুস্থ বোধ করে। কিন্তু ইতোমধ্যে পাকস্থলীর ঝিল্লী পর্দা ও অস্থিমজ্জার ক্ষতির ফলাফল মারাত্মক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। গলবিলে ও শ্বাসতন্ত্রে ঘা সৃষ্টি হয় এবং দেহে নানা ধরনের সংক্রমণ দেখা দেয়। চামড়ার ভেতরে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এবং পাকাস্ত্রে রক্তপাত হতে শুরু করে; কিছু পরে মাথার চুল পড়ে যেতে আরম্ভ করে।

পারমাণবিক বিকিরণের একটি মারাত্মক দিক হল এতে শুধু যে তাৎক্ষণিকভাবে দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ বিকল হয়ে যায় তা নয়, এর ফলে দেহে দীর্ঘস্থায়ী বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। ক্যান্সার, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম ও অন্যান্য জিনঘটিত বিকৃতি তার মধ্যে পড়ে। এসব ক্ষতির কিছুটা সরাসরি আক্রান্ত ব্যক্তিদের দেহে ঘটতে পারে; কিন্তু কোন কোন ধরনের ক্ষতি পরবর্তী বেশ কয়েক প্রজন্মের মধ্যে ঘটার আশংকা থাকে। বলা বাহুল্য, দেহে যে বিকিরণ পড়ছে তার তীব্রতা এবং কত সময় ধরে বিকিরণপাত ঘটেছে তার ওপর এসব ক্ষতির পরিমাণ ও ধরন অনেকখানি নির্ভর করে।

www.banglainternet.com

Goto List

নানা ধরনের বিস্ফোরণ

হিরোশিমা-নাগাসাকিতে যে পরমাণু-বোমা ফেলা হয়েছিল তার চেয়ে পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের ধ্বংসক্ষমতা আজ বহু গুণে বেড়েছে। হিরোশিমা-নাগাসাকির বোমার বিস্ফোরণক্ষমতা ছিল মোটামুটি ১৫ কিলোটন (অর্থাৎ ১৫,০০০ টন টিএনটি বিস্ফোরকের সমান)। আজ এর চেয়ে দশ গুণ এমন কি এক শ' গুণ ক্ষমতাসম্পন্ন পরমাণু-বোমার ওজন ঐ বোমার এক-পঞ্চমাংশ মাত্র হতে পারে।

হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসক্ষমতা সাধারণত মেগাটন এককে পরিমাপ করা হয়। এক মেগাটন অর্থ এক হাজার কিলোটন। আজ যে পাঁচটি প্রধান পরমাণু অস্ত্রধর রাষ্ট্র রয়েছে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীন) তাদের অস্ত্রভাণ্ডারে অসংখ্য এক মেগাটন শক্তির পরমাণু-বোমা সর্বক্ষণ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এযাবৎ সবচেয়ে বেশি শক্তির যে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে তার ক্ষমতা মোটামুটি ৫৮ মেগাটন।

এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পরমাণু-শক্তির ক্ষেত্রে এক দারুণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। পরমাণু অস্ত্রের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটাবার জন্য অন্যান্য রাষ্ট্র মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা ঘটায় ১৯৪৯ সালে; ব্রিটেন ১৯৫২ সালে, ফ্রান্স ১৯৬০ সালে; চীন ১৯৬৪ সালে। ১৯৭৪ সালে ভারতও একটি পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে প্রধান পারমাণবিক শক্তিগুলো বায়ুমণ্ডলে, মহাকাশে, ভূপৃষ্ঠে ও সমুদ্রগর্ভে অসংখ্য পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা চালিয়ে বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয়া ছড়ায়। এর ফলে পৃথিবীব্যাপী ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং এরপর পারমাণবিক পরীক্ষা প্রধানত ভূগর্ভে ঘটানো হতে থাকে। কিন্তু অনুমান করা হয় যে, মূল পারমাণবিক রাষ্ট্রগুলো ছাড়াও অন্য আরো বেশ কিছু দেশ গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে —এমন কি কেউ কেউ হয়তো ইতিমধ্যে সফল হয়ে পরমাণু-অস্ত্রের ছোটখাট মজুদও গড়ে তুলেছে।

পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণের মতোই ভয়াবহ অবস্থা ঘটতে পারে পরমাণু-শক্তিকেন্দ্রের দুর্ঘটনায়। চরনোবিলের পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর পর ৩১ জনের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা হয়। এই সংখ্যা তার আগের ৪২ বছরে সারা পৃথিবীতে তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত যত মৃত্যু ঘটেছে তার প্রায় সমান। তবে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে চরনোবিলের দুর্ঘটনার কারণে হয়তো শেষ পর্যন্ত পাঁচ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটেছে।

প্রথম দু'দিনে হাসপাতালে ভর্তি ১২৯ জনকে তাদের অসুস্থতার মাত্রা অনুসারে চারটি দলে ভাগ করা হয়। সবচেয়ে মারাত্মক ধরনের অসুস্থ ২৯ জনের ওপর আনুমানিক ৬ গ্রে (৬০০ র‍্যাড) পরিমাণ বিকিরণ পড়েছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাদের মাথা ব্যথা, জ্বর ও বমি দেখা দেয়; কয়েকদিনের মধ্যে মারাত্মক রক্তাল্পতার লক্ষণ প্রকাশ পায়; এরপর দেখা দেয় ডায়রিয়া। এদের ১৩ জনের অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন করা হয়, ৮ জনের শরীরে ভ্রূণদেহের

www.banglainternet.com

Goto List

যকৃৎকোষ প্রতিস্থাপন করা হয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউকেই বাঁচানো যায় নি।

চরনোবিলের তেজস্ক্রিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা থেকেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের অভিমত এই যে, গুরুতর তেজস্ক্রিয়া সম্পাতের কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও মানুষের জানা নেই। সংক্রমণ, জ্বর প্রভৃতি সমস্যার জন্য নানা ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়েছে; রক্ত দান ও অস্থিজ্জা প্রতিস্থাপনও ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু যথোপযুক্ত সদৃশ অস্থিমজ্জা সংগ্রহ, প্রতিস্থাপনের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ, প্রতিস্থাপনের কারণে নতুন রোগের সংক্রমণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে।

পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র

চরনোবিলের দুর্ঘটনা সারা পৃথিবীর পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। পৃথিবীর অনেক শিল্পোন্নত দেশেই আজ বিদ্যুৎশক্তির একটা বড় অংশ পরমাণু-চুল্লি থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে। এই হার ফ্রান্সে প্রায় ৭০ শতাংশ, বেলজিয়ামে ৬০ শতাংশ, সুইডেনে ৫০ শতাংশ, জার্মানিতে, ফিনল্যান্ডে ও সুইজ্যারল্যান্ডে ৪০ শতাংশ, জাপানে ৩০ শতাংশ এবং ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২০ শতাংশ। সারা পৃথিবীতে আগামী শতাব্দীতে তেল ও গ্যাস জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যাবে, তারপর ২১ বা ২২ শতকে কয়লাও নিঃশেষ হয়ে যাবার আশংকা। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক দেশই আরো নতুন নতুন পরমাণু-শক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে। কিন্তু চরনোবিলের ঘটনার পর সব দেশেই জনগণ তেজস্ক্রিয়ার বিপদ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস ছাড়া পরমাণু-শক্তিকেন্দ্র নির্মাণের বিরোধিতা করছে।

পরমাণু-শক্তি কেন্দ্রগুলোতে অবশ্য আগে থেকে যথেষ্ট নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে। সাধারণত ইউরেনিয়াম পিণ্ডযুক্ত কেন্দ্রস্থলের চারপাশে অতি পুরু ধাতব আধার ও তার চারপাশে পুরু কংক্রিটের আবরণ দেয়া হয়। এছাড়া পারমাণবিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বসানো হয় নিউট্রন-শোষক বোরন দণ্ড এবং শীতল করার ব্যবস্থা। আসলে এখানে একটা প্রধান বিপদ হল যদি কোন কারণে এই শীতল করার ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে তাহলে পারমাণবিক ক্রিয়াকরের কেন্দ্র গলে যেতে পারে এবং ভেতরে বাষ্পের চাপ বেড়ে উঠে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে; চরনোবিলে ঠিক তাই ঘটেছিল।

আজকাল যেসব পরমাণু-শক্তিকেন্দ্র চালু রয়েছে তার অধিকাংশেই পারমাণবিক ক্রিয়াকরের তাপকে বাষ্পে পরিণত করার জন্য সাধারণ পানি ব্যবহার করা হয়; তাই এদেরকে সচরাচর 'হালকা-পানি ক্রিয়াকর' বলা হয়। পরমাণু-শক্তিকেন্দ্রের নিরাপত্তা আরো জোরদার করার জন্য এই পানির প্রবাহ যাতে কোনোমতে ব্যাহত না হয় সে ধরনের নানা নতুন মডেলের ক্রিয়াকর তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্র নয়, সমস্যা ঘটায় যন্ত্রের চালক যেসব মানুষ তারা; তাদের অসাবধানতা থেকেই বিপদের সূচনা হয়।

www.banglainternet.com

Goto List

১৯৮৬ সালে চরনোবিলের দুর্ঘটনার সময়ও এমনি 'মানুষী ভুল' ঘটে। দুপুর রাতে চালকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ক্রিয়াকরের কার্যক্ষমতা বেশ কমিয়ে আনে; তারপর বিপদ সঙ্কেত অকেজো করে দিয়ে শীতল করার ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়। তার ফলে ভেতরে চাপ বেড়ে গিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং চারপাশে বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে।

দুর্ঘটনা আরো ঘটেছে

আসলে চরনোবিলের দুর্ঘটনা সারা পৃথিবীতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করলেও এ ধরনের অপেক্ষাকৃত ছোটখাট আকারের দুর্ঘটনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক ক্রিয়াকরে বা পরমাণু-শক্তিকেন্দ্রে এর আগেও বেশ কয়েকবার ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় রকম দুর্ঘটনা ঘটে ১৯৭৯ সালের ২৮ মার্চ। পেনসিলভ্যানিয়ার হ্যারিসবার্গ শহরের কাছে থ্রি মাইল আইল্যান্ড (Three Mile Island) নামে জায়গায় দু'টি পারমাণবিক চুল্লির একটিতে কর্মীদের অমনোযোগিতার কারণে শীতল করার পানি উবে যায়। তার ফলে ক্রিয়াকরের ভেতরে জ্বালানি ইউরেনিয়াম অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে আংশিকভাবে গলে যায়। কোন মৃত্যুর খবর জানা যায় নি, কিন্তু এই দুর্ঘটনা পরমাণু-শক্তি ব্যবহারের বিপদ নিয়ে সারা দেশে তুমুল বিতর্কের ঝড় তোলে।

এ ধরনের মানুষী ভুলের কথা মনে রেখেই আজ পারমাণবিক ক্রিয়াকরের যে সব নতুন মডেল তৈরি হচ্ছে তাতে নিরাপত্তার জন্য মূলত পদার্থবিদ্যা আর রসায়নশাস্ত্রের নিয়ম-কানুনের ওপরই নির্ভর করা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে এসব উন্নত ধরনের পারমাণবিক চুল্লি ২০০০ সাল নাগাদ শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যাবে। ইতোমধ্যে পরমাণু-শক্তিকেন্দ্র সম্বন্ধে মানুষের ভয়-ভীতি কাটানো হয়তো শক্ত হবে।

আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়তই আমরা নানা বিপদের সম্মুখিন হচ্ছি। কিন্তু অন্য সব বিপদের চেয়ে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়ার বিপদকে যেন মানুষ কিছুটা ভিন্ন চোখে দেখছে। পারমাণবিক ক্রিয়াকর যত সাবধানতার সঙ্গেই চালানো যাক না কেন তার মধ্যে কিছুটা বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায়—তা যদি মাত্র এক শ' বা দু'শ' বছরে একবার মাত্র হয় তবু তো তা বিপদই। এমনি কিছুটা বিপদের আশঙ্কা অবশ্য রয়েছে মোটরগাড়ি, উড়োজাহাজ, ট্রেন— এসব যানবাহন ব্যবহারেও। তবে এসব ক্ষেত্রে যাত্রী সেই বিশেষ যান ব্যবহার করবে কিনা সে বিষয়ে তার কিছুটা নির্বাচনের সুযোগ থাকে। কিন্তু পরমাণু-শক্তিকেন্দ্রে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তা একটি দেশের সীমানা ডিঙ্গিয়ে ভিন্ন দেশে অদৃশ্য মৃত্যুরশ্মির মারাত্মক বিপদ ছড়িয়ে দিতে পারে; তার ফলে শুধু বর্তমান প্রজন্মের মানুষ নয়, আগামী বহু প্রজন্মের মানুষ ক্যান্সার ও নানা ধরনের জন্মগত বিকলাঙ্গতার শিকার হতে পারে।

এক্ষেত্রে আরো একটি বড় বিপদ হল পৃথিবীতে প্রধান সামরিক শক্তিগুলোর মধ্যে আরো দক্ষ মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা আপাতত কিছুটা স্তিমিত হলেও একেবারে থেমে যায় নি। তার ফলে সহজে ব্যালিস্টিক মিসাইল বা রকেটের সাহায্যে দূরে নিক্ষেপ করা যায় এমন ছোট

www.banglainternet.com

Goto List

আকারের অথচ প্রচণ্ড মারণক্ষমতাসম্পন্ন পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের চেষ্টা চলছে। দু'ধরনের পারমাণবিক রশ্মি জীবদেহের অতি গভীরে প্রবেশ করে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে—এরা হল গামা রশ্মি ও নিউট্রন কণার রশ্মি। ছোট আকারের এমন হাইড্রোজেন বোমা আজ তৈরি হয়েছে যা থেকে বিপুল পরিমাণ নিউট্রন কণা নিঃসৃত হয় এবং তার ফলে চারপাশের বাড়িঘর মোটামুটি অক্ষত থাকে, অথচ সব রকম জীবদেহের মারাত্মক ক্ষতি হয়। এই বোমার নাম দেয়া হয়েছে 'নিউট্রন বোমা'। এ ধরনের প্রাণসংহারক নিউট্রন বোমার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীতে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় ওঠায় এই বোমা এখনও কোন যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় নি, কিন্তু ভবিষ্যতেও যে হবে না এবং চারপাশে ব্যাপক তেজস্ক্রিয়া ছড়াবে না তার কোন নিশ্চয়তা দেয়া যায় না।

পারমাণবিক বর্জ্য

পৃথিবীতে আজ যে প্রায় চার শ' পরমাণু-শক্তিকেন্দ্র রয়েছে তার ইউরেনিয়াম বা অন্য জ্বালানি কয়েক বছর পর পর বদলাতে হয়। এ সময় প্রচুর পরিমাণ পারমাণবিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে কিছু বর্জ্য শোধন করে তা থেকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি পাওয়া যায়, কিন্তু হাজার হাজার গ্যালন তরল জ্বালানি শোধনের অযোগ্য বলে সেগুলোর নিরাপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব জ্বালানি বড় বড় ধাতব ড্রামে ভরে ভূগর্ভের বহু নিচে পুরু কংক্রিটের আধারে জমা করে রাখা হয় এই আশায় যে, ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক নিয়মে এদের তেজস্ক্রিয়ার মাত্রা কমে আসবে এবং তখন আর এরা এমন বিপজ্জনক থাকবে না।

পরমাণু-শক্তি ও পরমাণু অস্ত্রের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয় বস্তু এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা একই দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরের প্রয়োজনও বাড়ছে। এ ধরনের স্থানান্তরের সময় তেজস্ক্রিয়া যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু পথে দুর্ঘটনার আশংকা কখনোই পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়া যায় না, এবং হঠাৎ কখনো সে রকম দুর্ঘটনা ঘটে গেলে যে এসব বস্তু থেকে চারপাশের লোকালয়ে তেজস্ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়বে না তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

পরমাণু-শক্তির এই যুগে শান্তিকালীন কাজে এই শক্তিকে একেবারে এড়িয়ে চলা আজ আর কোনো দেশের পক্ষেই সম্ভব নয়, বিশেষ করে সারা পৃথিবীতে যেখানে খনিজ জ্বালানি ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসছে সেখানে ভবিষ্যতে পারমাণবিক জ্বালানির ওপর হয়তো আমাদের অনেকটাই নির্ভর করতে হবে। অথচ এই শক্তির ব্যবহারের সঙ্গে যে এক নতুন ধরনের অদৃশ্য অথচ গুরুতর বিপদ লুকিয়ে আছে তাও আজ বাস্তব সত্য। সারা পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র মজুদ রয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে যে অসংখ্য পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র বসানো হয়েছে তা থেকেও দুর্ঘটনাক্রমে তেজস্ক্রিয়া ছড়াতে পারে। এমন কি চিকিৎসা বা রোগ নির্ণয়ের কাজে ব্যবহৃত রঞ্জন-রশ্মির অসাবধান ব্যবহারেও বিপদ নিহিত রয়েছে, বিশেষ করে

www.banglainternet.com

Goto List

আমাদের দেশে এক্স-রে ক্লিনিকগুলোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যেখানে এমন শিথিল। আজ তাই সবাইকেই তেজস্ক্রিয়ার বিপদ সম্বন্ধে জানতে হবে এবং এ সম্বন্ধে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

www.banglainternet.com

Goto List

হিরোশিমা–নাগাসাকির দগদগে ক্ষত

১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট স্থানীয় সময় সকাল ৮-১৫ মিনিট। জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপর পড়ল গভীর গোপনীতায় তৈরি পৃথিবীর প্রথম পরমাণু-বোমা। তার তিনদিন পর জাপানের নাগাসাকি শহরের ওপর পড়ল দ্বিতীয় পরমাণু-বোমা। প্রথম বোমাটি ছিল ইউরেনিয়ামভিত্তিক; এর ধ্বংস-ক্ষমতা ছিল মোটামুটি ১৫ হাজার টন অতিবিস্ফোরক টি.এন.টি.-র সমান। দ্বিতীয়টি ছিল প্লুটোনিয়ামভিত্তিক; এর ক্ষমতা ছিল ২২ হাজার টন টি.এন.টি.-র সমান। পরমাণু-বোমার প্রচণ্ড ধ্বসযজ্ঞে শহর দু'টি একেবারে মাটিতে মিশে গেল। দু'টি বোমায় যে পরিমাণ ধ্বংসকাণ্ড ঘটল তা ছিল একেবারেই মানুষের কল্পনার অতীত। তাই পরমাণু-বোমা নিয়ে সে সময়ে নানা লোমহর্ষক খবর প্রচারিত হতে লাগল আর সারা পৃথিবী জুড়ে বয়ে গেল আতঙ্কের শিহরণ।

হিরোশিমা আর নাগাসাকি দু'টি শহর মিলিয়ে প্রায় আড়াই লাখ লোক মারা পড়ে; তাদের অধিকাংশের মৃত্যু ঘটে বিস্ফোরণের প্রবল ঝাপটা আর এই বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডে; কিন্তু প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যু ঘটে তীব্র তেজস্ক্রিয়ার কারণে। আশির দশকের শেষে জাপানে এক ব্যাপক জরিপ চালিয়ে দেখা যায় হিরোশিমায় বিকিরণগ্রস্ত ও প্রথম পাঁচ মাসে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা মোটামুটি দেড় লাখ; নাগাসাকিতে এ রকম ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ৮০,০০০। দু'টি শহর মিলে তেজস্ক্রিয়ায় আক্রান্ত লোকের মোট সংখ্যা সাড়ে তিন লাখের ওপরে। এদের মধ্যে যারা প্রথম ধাক্কায় মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায় তাদেরও অনেকের পরে চোখের ছানি, লিউকেমিয়া, থাইরয়েড গ্রন্থির প্রদাহ, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্যান্সার এসব উপসর্গ দেখা দেয়।

জাপানে তেজস্ক্রিয়ায় আক্রান্ত লোকদের বলা হয় 'হিবাকুশা'। এ ধরনের একজন হিবাকুশা মিসেস অনেদা মিৎসুকো হিরোশিমায় বোমা পড়ার সময় ছিলেন ষোল বছর বয়সের স্কুল-ছাত্রী। বিস্ফোরণের মাত্র ১.৭০ কিলোমিটার দূরে একটি পোস্ট অফিসে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে অন্যান্য সহপাঠী ও শিক্ষকদের সঙ্গে তিনি তখন কাজ করছিলেন। কপাল গুণে তিনি পরমাণু-

www.banglainternet.com

Goto List

নাগাসাকিতে পরমাণু বিস্ফোরণে বিকৃত মা ও শিশু

www.banglainternet.com

Goto List

বোমার বিস্ফোরণের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যান; কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল মর্মস্পর্শী। সে সময়ের অভিজ্ঞতা তিনি পরবর্তীকালে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

> বিস্ফোরণের ধাক্কায় আমি পড়ে গেলাম। আমার সারা শরীর প্রচণ্ড তাপে যেন দগ্ধ হয়ে গেল; আমি জ্ঞান হারালাম। আমার ঘাড়, মুখমণ্ডল, হাত-পাসহ শরীরের অর্ধেকেরও বেশি জায়গা পুড়ে গেল। জ্ঞান ফিরলে দেখি চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার। চোখের সামনে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না বা কি ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না। কিছুক্ষণ পর যেন একটু আলো এল। পাশেই এক বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আমি ভয় পেয়ে গেলাম; তার হাতের চামড়া খসে পড়ে ঝুলছিল—যেন একটা ভূতের চেহারা। আরেক বন্ধুকে দেখলাম ভেঙ্গে পড়া বাড়ির তলায় চাপা পড়ে চিৎকার করছে।
>
> আমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি আমার পায়ের চামড়াও তেমনি ঝুলন্ত অবস্থায় খসে পড়েছে। আমাদের এক শিক্ষকের উপদেশমতো সে সব খসে যাওয়া চামড়া গায়ে চেপে ধরে আমি কাছের এক পাহাড়ে পালিয়ে গেলাম। সেখানে খোলা আকাশের নিচে বিনা চিকিৎসায় এক সপ্তাহ ভয়ে ভয়ে কাটালাম। ১৩ আগস্ট লোকজন আমাকে দেখতে পেয়ে এক হাসপাতালে নিয়ে গেল। ততদিনে আমার শরীরের ঘায়ে পোকা দেখা দিয়েছে। অনেকদিন সেই হাসপাতালে থাকার পর আমার বাবা আমার খোঁজ পান। ...
>
> আমার বাবা অক্ষত ছিলেন, তাই তিনি তাঁর আদরের মেয়ের যত্নে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু ক'দিন পর একদিন হঠাৎ তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। আরেক দিন তাঁর রক্তবমি হল। তারপর ৯ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। আমার জীবন ও ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে বুকভরা দুশ্চিন্তা নিয়েই তিনি চিরবিদায় নিলেন। তারপর একে একে অনেকেই মারা গেল। অসুস্থ হয়ে পড়ল আরো অনেকে। আমি আমাদের গ্রামের বাড়িতে চলে গেলাম।
>
> এক সময়ে আমার সারা শরীরের সমস্ত চুল পড়ে গেল। সারা শরীরে অসংখ্য ঘা; তা থেকে রক্তপাত হত প্রায়ই। মৃত্যুভয়ে জর্জরিত হয়েও জীবনের জন্য আমি যুদ্ধ করে চললাম। আমার বীভৎস চেহারার জন্য গ্রামের লোকজন বলত 'টেকো মাথা', 'ভূত' ইত্যাদি। জীবনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আমাকে বেঁচে থাকতে হল—শরীর আর মনের তীব্র কষ্টে আর বিষাদে মাঝে মাঝে মনে হত মৃত্যুই আমার জন্য ভাল। ... ১৯৫৭ সালে বিনা খরচে চিকিৎসা লাভের সরকারি আইন চালু হবার পর আমার দুর্বিষহ জীবনের অবসান ঘটল। আমি আবার চিকিৎসা লাভ করে ধীরে ধীরে সুস্থ জীবনে ফিরে আসি। [মোঃ আবদুল মতিন, "হিবাকুশা: পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্বের জন্য আকুতি", সংবাদ, ৩১.০৭.৯০]

ইতিহাসের পরিহাস

পরমাণু-বোমার সঙ্গে ইতিহাসের এক নিদারুণ পরিহাস জড়িয়ে আছে। শুধু এই শতাব্দীর নয়, সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কীর্তি হল আইনস্টাইনের

www.banglainternet.com

Goto List

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। এই তত্ত্ব থেকে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, একদিন মানুষ বস্তুর পরমাণুর বুকে লুকানো প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হবে। অবশেষে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে জার্মানিতে অটো হান আর স্ট্রাসমান নামে দু'জন বিজ্ঞানী ইউরেনিয়াম-২৩৫ মৌলের পরমাণু ভেঙ্গে তার কেন্দ্রের এই শক্তির প্রমাণ পেলেন; আর বাস্তবে এই শক্তিকে প্রত্যক্ষ করার কৌশল আবিষ্কৃত হল ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে আমেরিকার নিউ মেক্সিকোতে আলমাগর্ডো-র মরুপ্রান্তরে। এই পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ করলেন পরমাণুর প্রলয়ঙ্করী রূপ। সভ্যতার ইতিহাসের নিদারুণ পরিহাস এই যে, মার্কিন সরকার তাড়াহুড়ো করে মাত্র তিন সপ্তাহের মাথায় সে শক্তির প্রথম ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটালেন মানুষের কোন কল্যাণকর কাজে নয়, জনপদের ওপর পর পর দু'টি প্রচণ্ড ধ্বংসকাণ্ড ঘটিয়ে অসংখ্য মানুষের দেহকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবার জন্য।

অবশ্য সে সময়ে আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান সম্ভবত নিজেদের বিবেককে আশ্বস্ত করার জন্যই বলেছিলেন, হিরোশিমায় যে লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করা হয়েছে তা কোন জনাকীর্ণ এলাকা নয়, নেহাতই একটা সেনা ছাউনি। কিন্তু আজ থলের বেড়াল বেরিয়ে এসেছে। আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, হিরোশিমায় আসলে তেমন কোন সামরিক লক্ষ্যবস্তু ছিল না, বরং পরমাণু-অস্ত্রের লক্ষ্যস্থল নির্ধারণের জন্য ট্রুম্যান যে বিশেষ কমিটি নিয়োগ করেন তাদের স্পষ্ট সুপারিশ ছিল বেশি লোক ধ্বংস হয় এরকম ঘনবসতিপূর্ণ শহরই লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্বাচন করতে হবে। তখন সোভিয়েত বাহিনী জাপানের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছিল। এমন জনাকীর্ণ শহরের কেন্দ্রস্থলে এই ভয়ঙ্কর বোমা ফেলার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জাপানিদের মনে, বিশেষ করে সোভিয়েত সরকারের মনে, মার্কিনী শক্তি সম্পর্কে আতঙ্ক সঞ্চার করা যাতে জাপান সোভিয়েত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ না করে মার্কিনীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে আর যুদ্ধশেষে লুঠের ভাগ-বাঁটোয়ারায় কিছু সুবিধে আদায় করা যায়।

১৯৪৫-এর মে মাসে ইউরোপে জার্মানির পতন ঘটে। চারদিক থেকে রসদ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দূরপ্রাচ্যর রণক্ষেত্রে জাপানের মেরুদণ্ড এমনিতেই ভেঙ্গে পড়েছিল। জাপান বুঝতে পেরেছিল অবিলম্বে আত্মসমর্পণ ছাড়া তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। তারা মিত্রশক্তির কাছে নানা রকম শান্তিপ্রস্তাব পাঠাতে শুরু করেছিল; তাতে একমাত্র অনুরোধ ছিল যুদ্ধের পর দেশে যাতে অরাজকতা সৃষ্টি না হয় এবং স্বৈরশক্তি প্রাধান্য বিস্তার না করে সেজন্য জাপানের সম্রাটের ক্ষমতা যেন কেড়ে নেয়া না হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ হিরোশিমা ও নাগাসাকির জনপদের ওপর এই বোমা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়; তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধোত্তর ক্ষমতা ও সম্পদের ভাগাভাগিতে সুবিধে আদায় করা। আর তার জন্য এই সমরনেতাদের কাছে তিন-চার লক্ষ লোকের জীবন বিসর্জন এমন কোন ব্যাপারই মনে হয় নি।

অথচ ঠাণ্ডা মাথায় এমন পারমাণবিক ব্ল্যাক-মেইলের যা ফল হবার তাই ঘটল। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকার পরমাণু-অস্ত্রের একাধিপত্য ভাঙ্গার জন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত সোভিয়েত

www.banglainternet.com

Goto List

ইউনিয়ন সর্বশক্তি নিয়ে উঠে পড়ে লাগল; মাত্র তিন বছর পর ১৯৪৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত রাশিয়া পরমাণু-অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটায়। তারপর ক্রমে ক্রমে পরমাণু-অস্ত্রের অধিকারী হল গ্রেট ব্রিটেন (১৯৫২), ফ্রান্স (১৯৬০) আর চীন (১৯৬৪)। সারা দুনিয়া জুড়ে প্রবলভাবে পরমাণু-অস্ত্রের প্রতিযোগিতা চলল আর তার আনুষঙ্গিক হিসেবে পৃথিবীর পরিবেশ মারাত্মক তেজস্ক্রিয়ায় বিষিয়ে তুলে স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো শুরু হল। ১৯৫২ সালে আমেরিকা হিরোশিমা ধরনের পরমাণু-বোমার চেয়ে প্রায় আট শ' গুণ শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়; সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পরের বছরই এমনি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাল। পরমাণু-অস্ত্র প্রতিযোগিতা প্রবল বিক্রমে এগিয়ে চলল। শেষ পর্যন্ত এমন হাইড্রোজেন বোমা তৈরি হল যার ধ্বংসক্ষমতা ষাট মেগাটন অর্থাৎ হিরোশিমা-ধরনের প্রায় চার হাজার পরমাণু-বোমার সমান।

পরমাণু-অস্ত্রকে রুখতে হবে

পরমাণু-অস্ত্র তৈরি অবশ্যই বিজ্ঞানীদের সাহায্য ছাড়া সম্ভব হত না। আসলে জার্মানিতে হিটলার পরমাণু-অস্ত্র তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে এই আশঙ্কা থেকে বিজ্ঞানীদের পক্ষ হয়ে আইনস্টাইন নিজেই ১৯৩৯ সালের ২রা আগস্ট অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর মাত্র এক মাস আগে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে একটি চিঠি লেখেন যাতে মার্কিন সরকার অবিলম্বে পরমাণু-অস্ত্র তৈরির উদ্যোগ নেন। অবশেষে জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করার পর ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন সরকার জেনারেল লেসলি গ্রোভস্-এর তত্ত্বাবধানে 'ম্যানহাটান প্রকল্প' ছদ্মনামে পরমাণু-অস্ত্র তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করে। তাতে মাত্র তিন বছরে সে সময়ের মূল্যমানে ব্যয় হয় দু'শ' কোটি ডলার (আজকের মূল্যমানে হবে ছ শ' কোটি ডলারের ওপরে)।

পরবর্তীকালে আইনস্টাইন পরমাণু-অস্ত্র তৈরি সম্পর্কে তাঁর ওই চিঠি লেখার জন্য অনেক অনুশোচনা করেছেন; অনেকটা এর প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই সম্ভবত তিনি তার পর দীর্ঘকাল ধরে পরমাণু-অস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে থেকেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা বড় অংশ যুদ্ধের ধ্বংসকাণ্ডের নির্বুদ্ধিতায় ও বিশেষ করে পরমাণু-অস্ত্রের ভয়াবহতায় শঙ্কিত হয়ে যুদ্ধবিরোধী মোর্চা গড়ে তুলতে থাকে। গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরমাণু-বিজ্ঞানীদের শক্তিশালী সমিতি গড়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী জোলিও-কুরির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'বিশ্ব বিজ্ঞানকর্মী ফেডারেশন'। পরমাণু-অস্ত্রবিরোধী জঙ্গী আন্দোলনে বিজ্ঞানকর্মীরা এগিয়ে আসতে থাকেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আলবার্ট আইনস্টাইন, রবার্ট ওপেনহাইমার (যিনি পরমাণু-বোমা নির্মাণ প্রকল্পে গবেষণাগারের প্রধান ছিলেন), হ্যারল্ড উরে, লাইনাস পলিং, ইউজিন রাবিনোভিচ; গ্রেট ব্রিটেনে বার্ট্রান্ড রাসেল, পি.এম.এস. ব্ল্যাকেট, জে.ডি. বার্নাল প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এসব আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধশেষের পরবর্তী ক'টি বছর কমিউনিস্ট জুজুর ভয় কোন কোন দেশের রাজনীতিকে গ্রাস করে; তার ফলে এসব শান্তিবাদী আন্দোলনকে

www.banglainternet.com

Goto List

কমিউনিস্ট চক্রান্ত হিসেবে দেখার প্রবণতা থেকে অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী নির্যাতনের শিকার হন। কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারিত হন মার্কিন পরমাণু-শক্তিসংস্থা প্রধান রবার্ট ওপেনহাইমার ও ফরাসি পরমাণু-শক্তিসংস্থা প্রধান ফ্রেদরিক জোলিও-কুরি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরমাণু-অস্ত্র ও যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে আন্দোলন এমন ব্যাপক রূপ নেয় যে, তাতে পাবলো পিকাসো, আঁদ্রে মালরো, পাবলো নেরুদা প্রমুখ অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী শরিক হন।

১৯৫৪ সালের ১ মার্চ তারিখে প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষার সময় তেজস্ক্রিয় ভস্ম বাতাসে ভর করে সোয়াশ' কিলোমিটার দূরে খোলা সমুদ্রে জাপানি জেলেদের গায়ে গিয়ে পড়ে। ঘটনাটি গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়ে জানাজানি হয়ে গেলে পরমাণু-অস্ত্র পরীক্ষার বিরুদ্ধে দুনিয়া জুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ১৯৫৫ সালের ১১ এপ্রিল আলবার্ট আইনস্টাইন ও বার্ট্রান্ড রাসেল-এর উদ্যোগে বিজ্ঞানীদের বিখ্যাত যুদ্ধবিরোধী ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই ঘোষণায় তাঁরা পরমাণু-অস্ত্র নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে বললেন:

> ...ক্ষমতার আসনে যাঁরা আজ বসে আছেন তাঁদের অনেকেই এখনও বুঝতে পারছেন না পারমাণবিক যুদ্ধের ফলাফল কী হতে পারে। ... আগামী যুদ্ধে হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহৃত হলে তা হয়তো বিনাশ ঘটাবে সমগ্র মানব সভ্যতার ... আমাদের সামনে আজ দেখা দিয়েছে সর্বজনীন মৃত্যুর এক সমূহ বিপদ।

এদিকে পঞ্চাশের দশক থেকে জাতিসঙ্ঘের সদস্য উন্নয়নশীল দেশগুলো বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর শক্তিবলয়ের বাইরে একটি নিরপেক্ষ জোট গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। এই উদ্যোগের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল বৃহৎ শক্তিগুলোর সম্ভাব্য সংঘাতের হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা। এসব নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উদ্যোগে পরমাণু-অস্ত্র নিষিদ্ধ করে জাতিসঙ্ঘে প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৯৬১ সালে। এই প্রস্তাবে স্পষ্ট ভাষায় বলা হল পারমাণবিক বা তাপপারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ হবে সরাসরিভাবে জাতিসঙ্ঘ সনদের খেলাপ। কোন রাষ্ট্র যদি এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে তবে তাকে মানবতাবিরোধী এবং মানব জাতি ও মানব-সভ্যতার বিরুদ্ধে অপরাধী বলে গণ্য করা হবে।

ষাটের দশকে জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে এ ধরনের আরো বেশ ক'টি প্রস্তাব ও চুক্তি অনুমোদিত হয়। ১৯৬৩ সালে স্বাক্ষরিত হয় বায়ুমণ্ডল, মহাকাশ ও সমুদ্রতলে পরমাণু-অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি। ১৯৬৮ সালে স্বাক্ষরিত হল পরমাণু-অস্ত্র বিস্তার নিরোধ চুক্তি (NPT)। ১৯৮২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে।

তবে এসব প্রতিশ্রুতি ঘোষণা আর বাস্তবে তার প্রতিপালন এক কথা নয়। বিশ্বের জনগণের প্রবল প্রতিরোধের মুখে দীর্ঘকাল পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ ছিল। কিন্তু সে

www.banglainternet.com

Goto List

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে ফ্রান্স আবার প্রশান্ত মহাসাগরের মুরোরোয়া দ্বীপে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা আরম্ভ করেছে। এর পর আরো কোন কোন শক্তি যে সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া গত পাঁচ দশকে নানা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির এমন অগ্রগতি ঘটেছে যে, পরমাণু-অস্ত্র তৈরি আজ আর চল্লিশের দশকের মতো কঠিন বা ব্যয়সাধ্য ব্যাপারও নয়। অনেকের ধারণা, পুরনো পারমাণবিক অস্ত্রধর শক্তিগুলোর সঙ্গে আজ গোপনে আরো অনেকগুলো রাষ্ট্র যোগ দিয়েছে। তাদের মধ্যে ইসরায়েল, ইরান, ব্রাজিল, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের কথা প্রায়শ প্রকাশ্যেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে অনেক রাষ্ট্র পরমাণু-অস্ত্র বিস্তার চুক্তি স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

তাছাড়া সারা পৃথিবীতে আজ প্রকাশ্যভাবেই অন্তত পঞ্চাশ হাজার প্রবল শক্তিশালী পরমাণু-অস্ত্র মজুত আছে। সেগুলোর মিলিত ধ্বংসক্ষমতা কম করেও দু'হাজার কোটি টন অতিবিস্ফোরক টি.এন.টি.-র সমান, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের জন্য তৈরি আছে অন্তত চার টন টি.এন.টি. বিস্ফোরকের সমান পরমাণু-অস্ত্র। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে পড়ার পর এবং নানা রাষ্ট্রের হাতে গোপন পরমাণু-অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে ওঠায় পারমাণবিক অস্ত্রের নিরাপত্তার প্রশ্নটিতে আবার নতুন করে জটিলতা দেখা দিয়েছে। তার ফলে যে কোন সময় পৃথিবীর যে কোন বড় বা স্থানীয় সংঘাতে পরমাণু-অস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা আজ মোটেই উড়িয়ে দেয়া যায় না।

এ ক্ষত মুছবার নয়

হিরোশিমা-নাগাসাকির দগদগে ক্ষত পৃথিবীর বুক থেকে কখনো মুছবার নয়। এই দু'টি শহরে কয়েক লক্ষ মানুষ পরমাণু-বোমার আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। আরো অসংখ্য মানুষ আহত, পঙ্গু বা বিকিরণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে এই অর্ধ শতাব্দী পরও অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হল বিজ্ঞানের এক পরম দান পরমাণুশক্তিকে এমন বীভৎস মৃত্যুর দূত হিসেবে ব্যবহার কি নৈতিকতাসম্মত? জাপানের ওপর বোমা বর্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত মার্কিন বিমান বাহিনীর জেনারেল কার্টিস লে-মে নাকি নিশ্চিন্ত প্রশান্তি নিয়ে বলেছিলেন, "যুদ্ধের আসল ব্যাপারটা তোমাদের বলি। সে হল মানুষ মারা। যত বেশি মানুষ মারতে পারবে তত তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ হবে। ..." এমনি বড় আকারে মানুষ মারার জরুরি প্রয়োজনে আবারো যে লক্ষ লক্ষ এমন কি কোটি কোটি নিরপরাধ বেসামরিক মানুষকে আত্মাহুতি দিতে হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

এই সমরনায়কদের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মরেছিল দু'কোটি মানুষ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মরতে হয় পাঁচ কোটি মানুষকে। তার ওপর যুদ্ধে কত যে আহত ও পঙ্গু হয়েছে তার তো লেখাজোখা নেই। কিন্তু এই মৃত্যুযজ্ঞ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পুরোপুরি আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রধানত হয়েছিল প্রচলিত অস্ত্রের সাহায্যে। এত মানুষ মারার জন্য পরমাণু-অস্ত্রের প্রয়োজন

www.banglainternet.com

Goto List

হয় নি। কিন্তু আজ পরমাণু অস্ত্রও এসে নেমেছে মাঠে। এবার যুদ্ধ বাধলে পরমাণু-অস্ত্রের ব্যবহার নির্ঘাৎ হবে। আর তাতে কত মানুষের মৃত্যু হবে তা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

১৯৮২ সালে নিরস্ত্রিকরণ প্রশ্নে জাতিসঙ্ঘের একটি বিশেষ অধিবেশন বসেছিল। তার উদ্বোধনী ভাষণে জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব বলেছিলেন:

পারমাণবিক যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। পরমাণু-অস্ত্র প্রয়োগ একবার আরম্ভ হলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার আদৌ কোন উপায় থাকবে না। এতে শুধু যে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটবে তা নয়, পৃথিবীর পরিবেশে ঘটবে গুরুতর পরিবর্তন আর মানব সভ্যতার ভিত্তিভূমি সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে। আর এজন্যই পারমাণবিক যুদ্ধ প্রতিরোধ শুধু আমাদের নৈতিক দায়িত্ব নয়, মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। এই পঞ্চাশ বছর ধরে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে নি সে প্রধানত দুনিয়ার জাগ্রত জনমতের কারণে। আজ সারা পৃথিবীর সামনে পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের যে বিপদ নিরন্তর হুমকি সৃষ্টি করে চলেছে তাকে মোকাবিলার করারও একমাত্র চাবিকাঠি হল এই জাগ্রত জনমত আর জনগণের সক্রিয় ও সংগঠিত প্রতিরোধ।

www.banglainternet.com

Goto List

জীবজগতের বৈচিত্র্য কমে আসছে

আমাদের চারপাশে যে বিশাল রূপময় পৃথিবীকে আমরা দেখি তার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বৈচিত্র্য। এই সীমাহীন বৈচিত্র্য যেমন প্রকৃতির নিজের তেমনি সে প্রকৃতি যে জীবনধারাকে লালন করে চলেছে তারও। দেশে দেশে কত না পাহাড় নদী সাগর, কত জাতের পোকামাকড়, গাছপালা, পশুপাখি। দিন-রাত কত বিচিত্র সাজে প্রকৃতি নিজেকে সাজিয়ে রাখে! পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে কত ধরনের মানুষ, আর কত বিচিত্র তাদের জীবনযাত্রা!

তবে দুনিয়াজোড়া সব মানুষের এত বৈচিত্র্য থাকলেও তাদের মধ্যে একটা বিষয়ে খুব মিল খুঁজে পাওয়া যাবে: সে হল তাদের সবার জীবন একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে, পরিবেশের গাছপালা-পশুপাখির সঙ্গে। একেক দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, উদ্ভিদ আর প্রাণিজগতের সঙ্গে খাপ খাইয়েই গড়ে উঠেছে সে সব দেশের মানুষের জীবন যাত্রার ধরন। মরুভূমি আর মেরুর দেশের জীবন, পাহাড়ি আর নদীতীরের জীবন একান্তভাবে আবর্তিত তাদের পরিবেশকে ঘিরে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে: গাছপালা পশুপাখি যদি আদৌ না থাকত তাহলে কি পৃথিবীতে মানুষ বাঁচত? এ প্রশ্নের এ ধরনের একটা জবাব দেয়া যায়: আর কোনো ধরনের মানুষের উদ্ভব হলে তারা হয়তো বা বাঁচতেও পারে, কিন্তু আজ যে ধরনের মানুষ পৃথিবীতে বাস করে তারা নিশ্চয়ই বাঁচত না।

সারা পৃথিবীতে আজ বহু জাতের গাছপালা, পশুপাখি আছে; কিন্তু কত জাতের তা কি আমরা ঠিকমতো জানি? বিজ্ঞানীরা আজ শুধু এর একটা মোটা দাগের হিসেব বলতে পারেন; সে হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীতে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা মোটামুটি চার লাখ আর প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা এগার লাখ হবে—অর্থাৎ সব মিলিয়ে পনের লাখের মতো। তবে এ হিসেবে বেশ খানিকটা ফাঁক আছে। তাই অনেকেরই ধারণা হল আসলে প্রজাতির সংখ্যা হবে এর চেয়ে ঢের বেশি—হয়তো ত্রিশ লাখ; আবার আর কারো কারো মতে এই সংখ্যাটি তিন কোটি হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

www.banglainternet.com

Goto List

এই যে বিজ্ঞানীদের হিসেবের মধ্যে এমন বিশাল ফাঁক, এ থেকে বোঝা যায় সব দেশের সব গাছপালা আর প্রাণী প্রজাতির খবর তাঁরা এখনও যোগাড় করে উঠতে পারেন নি। বিশেষ করে আমাজনের নিরক্ষীয় গভীর বনাঞ্চল এবং পৃথিবীর আরো সব অজানা আর দুর্গম বন-জঙ্গলে এখনও বহু প্রজাতি (প্রধানত উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ আর অমেরুদণ্ডীদের প্রজাতি) রয়ে গিয়েছে মানুষের হিসেবের বাইরে । এমন কি যে পনের লাখ প্রজাতির খবর বিজ্ঞানীরা জানেন তাদেরও মাত্র দশ শতাংশের মতো এযাবৎ তাঁদের বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতায় এসেছে; বাকিদের সম্বন্ধে অনেক কথাই এখনও রয়েছে অজানা।

অতি সাফল্য থেকে বিপদ

এ পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে। ঠিক কখন সে হিসেব খানিকটা নির্ভর করে মানুষ বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি তার ওপরে। তবে হিসেবটা যে বিশ-ত্রিশ লাখ বছরের কম হবে না তা অবশ্য বলা যায়। সে যাই হোক, মানুষ যখন প্রথম আসে তখন স্বভাবতই তার সংখ্যা ছিল কম। তবে মানুষ যেহেতু হয়ে উঠেছিল অন্য যে কোন প্রাণীর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান তাই তার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে অন্য সব প্রাণীর চেয়ে দ্রুত। গত কয়েক শতকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির হাতিয়ার নিয়ে মানুষ যেমন শক্তিমান হয়ে উঠেছে তেমনি তার বংশ বৃদ্ধির গতিও দ্রুততর হয়েছে। মানুষের এই অতি সাফল্য আর দ্রুত বংশ বৃদ্ধি পৃথিবীর উদ্ভিদ আর প্রাণীকুলের জন্য রীতিমতো সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষের জীবন যাপনের সুবিধের খাতিরে তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

এই বিশ শতকে এসে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির হার যেমন বেড়েছে তেমনি নগরায়ণও ঘটেছে দ্রুতগতিতে। এই শতকের শুরুতে পৃথিবীতে নগরবাসী মানুষের হার ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র দশ শতাংশের মতো; এখন সে হার দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ শতাংশের কাছাকাছি। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে নগরায়ণের হার বেড়েছে আরো বেশি —মোটামুটি দু'শতাংশ থেকে পঁচিশ শতাংশের মতো। নগরায়ণের এই রুদ্ধশ্বাস গতি একাধারে রিক্ত করে তুলছে গ্রামাঞ্চল আর বনাঞ্চলকে; সেই সঙ্গে বিপন্ন করছে দুনিয়াজোড়া জীবজগতের বৈচিত্র্য।

আসলে শুধু তো নগরবাসীর সংখ্যা বাড়ছে না; বাড়ছে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যাই। উনিশ শতকের শুরুতে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল এক শ' কোটির নিচে। এই জনসংখ্যা সৃষ্টি হয়েছিল বহু লক্ষ বছরের ধীর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আর সম্ভবত এ সময়েই ছিল পৃথিবীতে জীবজগতের সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্য। জীবজগতের বৈচিত্র্য মানে হল নানা বিচিত্র প্রজাতির উদ্ভিদ, নানা বিচিত্র প্রজাতির প্রাণী। এমনি অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ আর প্রাণীকে মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করতে থাকে তার জীবনযাত্রা পদ্ধতির উন্নয়নের কাজে।

আজ এই বিশ শতকের শেষে এসে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে বিপুলভাবে; পাঁচ শ' কোটির অঙ্ক ছাড়িয়ে সে সংখ্যা আজ ছ'শ কোটি ছুঁই ছুঁই করছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সারা দুনিয়া জুড়ে

www.banglainternet.com

Goto List

মানুষের অপ্রতিহত পদসঞ্চারের ফলে কমে আসছে জীবজগতের বৈচিত্র্য। বিজ্ঞানীরা বলছেন, গত দু শ' বছরে অব্যাহত গতিতে প্রজাতির সংখ্যা কমেছে। তাঁদের হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত উঁচু শ্রেণীর প্রজাতি রয়েছে প্রায় ৪৫,০০০ (স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ও উভচর প্রজাতি প্রায় ১৫,০০০, পাখির প্রজাতি প্রায় ৯,০০০ আর মাছের প্রজাতি প্রায় ২১,০০০)। তার মধ্যে গত দু শ' বছরে প্রায় দু'শতাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং এক শতাংশের ওপর পাখি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে। আরো অন্তত পাঁচ শতাংশ স্তন্যপায়ী আর আট শতাংশ পাখি প্রজাতি আজ বিলুপ্তির মুখোমুখী। এভাবে চললে আগামী তিন দশকের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবীর ৫ থেকে ১৫ শতাংশ প্রজাতি; একুশ শতকের মাঝামাঝি পৌঁছবার আগেই নিশ্চিহ্ন হবে পৃথিবীর প্রজাতি সম্পদের প্রায় ২৫ শতাংশ।

গত কয়েক শ' বছরে পৃথিবীর ইতিহাস আর তাতে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ আর প্রাণীদের নিয়ে যে সব গবেষণা হয়েছে তাতে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, এত নানা রকম প্রাণী আর উদ্ভিদ আকস্মিক একদিন পৃথিবীতে এসে হাজির হয় নি। আদতে খুব সম্ভব পৃথিবী একদিন ছিল প্রাণহীন একটি পিণ্ড ; ক্রমে ক্রমে নানা রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাতে এক আদি প্রাণকণার উদ্ভব ঘটেছিল; তারপর সেই প্রাণকণা থেকেই বিচিত্র বিকাশের পথ ধরে নানা ধরনের উদ্ভিদ আর প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে। প্রাণের এমনি বিকাশ ঘটেছে প্রায় চার শ' কোটি বছর ধরে ধাপে ধাপে। আর এই চার শ' কোটি বছর ধরেই প্রাণের নানা বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক আন্তঃসম্পর্ক আর পারস্পরিক নির্ভরতা। প্রতিটি প্রজাতি তার পরিপার্শ্বের অন্য নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্গে এবং তার পরিবেশের নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে টিকে থাকে। কাজেই যে কোন একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হলে অন্য বহু প্রজাতির জীবনধারার ওপর তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে। তাই অনেক ধর্মমতেও বলা হয়ে থাকে জীবজগতের সব ধরনের উদ্ভিদ আর প্রাণীরই বেঁচে থাকবার অধিকার রয়েছে।

সাধারণত দেখা যায় গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশগুলোর প্রজাতি সম্পদ নাতিশীতোষ্ণ বা হিমমণ্ডলের দেশের চেয়ে বেশি। তার মধ্যে আবার বাংলাদেশ উদ্ভিদ আর প্রাণী প্রজাতি সম্পদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এদেশে রয়েছে অন্তত ৫,০০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ, ৫০০ প্রজাতির মাছ, ১৯ প্রজাতির উভচর, ১২৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ৫৭৯ প্রজাতির পাখি আর ১২৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদেশে নানা ধরনের খাদ্যশস্যের প্রজাতিও রয়েছে প্রচুর। নদীতে আর উপকূলে শুধু চিংড়িই রয়েছে প্রায় ৩০ প্রজাতির।

মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি আর বেহিসেবী বৃক্ষ নিধনের কারণে আজ বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ দ্রুত কমে যাচ্ছে। যেখানে দেশের অন্তত এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় বন থাকা দরকার সেখানে প্রকৃত বনের পরিমাণ নেমে এসেছে পাঁচ শতাংশের নিচে। তার ফলে বেশ কিছু উদ্ভিদ আর প্রাণী প্রজাতি সম্প্রতি বিলুপ্ত হয়েছে; ১১ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ১৩ প্রজাতির পাখিসহ আরো বহু প্রজাতি আজ বিলুপ্তির মুখোমুখি। এভাবে চললে দু'তিন

www.banglainternet.com

Goto List

দশক পরে বাংলাদেশে আর কোন বনাঞ্চলের অস্তিত্ব থাকবে না। বলাই বাহুল্য, সেদিন এক ভয়ঙ্কর পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দেবে।

এই শতাব্দীর মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে যে সব বন্যপ্রাণী হারিয়ে গেছে তাদের মধ্যে রয়েছে তিন প্রজাতির গণ্ডার, বুনো মোষ, পারা হরিণ, নীলগাই, নেকড়ে, গৌর (বাইসনের মতো প্রাণী), বান্টিং (এক জাতের বনগরু), লালশির হাঁস, ময়ূর, মেছো কুমির—এমনি বহু প্রাণী। আরো অনেক প্রজাতির প্রাণী আজ বিলুপ্তির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে রয়েছে সুন্দরবনের বাঘ আর চিত্রা হরিণ, ভালুক, উড়ন্ত কাঠবিড়ালি, হাড়গিলা, শকুন, লক্ষ্মীপেঁচা, বাদিহাঁস, ঘড়িয়াল, গুইসাপ ইত্যাদি।

বাংলাদেশে একদিন প্রায় দশ হাজার প্রজাতির ধান দেখা যেত। কিন্তু ষাটের দশক থেকে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ আরম্ভ হবার পর ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কম ফলন দেয় এমন দেশি জাতের ধানের চাষ কমে যেতে থাকে। আজ দেশের প্রায় অর্ধেক ধান আসছে উচ্চ ফলনশীল জাতের গাছ থেকে। কিন্তু এসব জাতের বংশানুক্রমে নিজের গুণাগুণ ধরে রাখার ক্ষমতা কম; তাছাড়া রোগে, খরায় এসব জাত কাবু হয়ে পড়ে বেশি। কাজেই শেষ পর্যন্ত এ ধরনের জাতের ফসলের ওপর অতিনির্ভরতা দেশের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। এছাড়া ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের চাষের ওপর বেশি গুরুত্ব দেবার কারণে ডাল, তেলবীজ প্রভৃতি চাষের ওপর ক্রমেই কম জোর দেয়া হচ্ছে; এটাও ফসলের বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সুন্দরবনের রাজসিক বাঘ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে রয়েছে সুন্দরবনের বিশাল বনভূমি—আয়তন মোটামুটি চার হাজার বর্গ কিলোমিটার। এটি হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল; পাশের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেকার এলাকা এবং ডাঙ্গা-পানি মিলিয়ে ধরলে হবে প্রায় দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এছাড়া এই বনভূমিতে রয়েছে পৃথিবীর সেরা বাঘ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (*Panthera tigris*); আর আছে অপরূপ রূপময় চিত্রা হরিণ (*Cervus axis*)। শ' খানেক বছর আগেও দেশের প্রায় অর্ধেক জায়গায়, এমন কি ঢাকা শহরের আশেপাশেও বাঘের দেখা পাওয়া যেত। কিন্তু আজ বন জঙ্গল কমে আসায় দেশের আর কোথাও বাঘের দেখা পাওয়া যায় না; বাঘ আটকা পড়েছে কেবল সুন্দরবন এলাকায়। তাও পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই খবর দেখতে পাওয়া যায়: চোরা শিকারীদের কবলে পড়ে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যাও দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায় এককালে সুন্দরবন বিস্তৃত ছিল বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালি, ফরিদপুর, নোয়াখালি জেলা জুড়ে। কিন্তু মানুষ কাঠ, কাগজের মণ্ড, শিকারের পশু, মাছ, মধু এসব মূল্যবান সম্পদের জন্য সুন্দরবনকে তছনছ করছে বছরের পর বছর ধরে; তার ফলে আজ প্রকৃত বনের এলাকা কমতে কমতে নেমে এসেছে চার হাজার বর্গ কিলোমিটারের নিচে।

www.banglainternet.com

Goto List

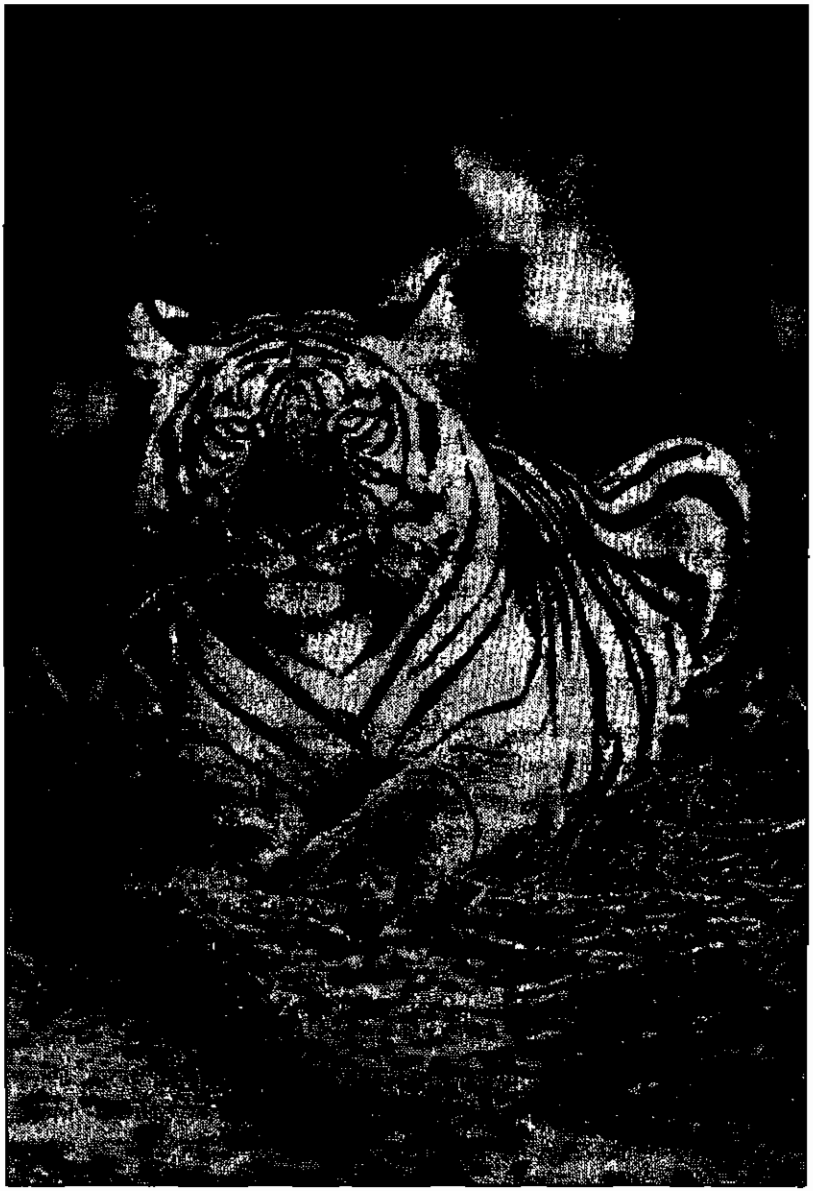

সুন্দরবনের রাজসিক বাঘ

www.banglainternet.com

Goto List

সুন্দরবনে গাছ কাটা সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কথা; কিন্তু তা আদপে মোটেই কার্যকর হচ্ছে বলে মনে হয় না। তার ফলে ১৯৮৫ সালে এক জরিপে দেখা যায় সুন্দরবনের যে প্রধান দু'ধরনের গাছ সুন্দরী (*Heritiera fomes*) আর গেওয়া (*Excoecaria agallocha*) তার সংখ্যা দু'দশকের মধ্যে মারাত্মকভাবে কমে গেছে। সুন্দরবনের দক্ষিণের দিকে উপকূল অঞ্চলের পানি বেশ নোনা; উত্তরদিকের পানি অপেক্ষাকৃত মিষ্টি (অর্থাৎ নোনা নয়)। আর এই এলাকাতেই গাছপালা জন্মায় সবচেয়ে ভাল। গঙ্গা নদীর উজানে ভারতের ফারাক্কা বাঁধ তৈরির কারণে শুকনোর সময়ে গঙ্গার প্রবাহ প্রায় চল্লিশ শতাংশ কমে যায়; তাতে সুন্দরবনের লবণাক্ত পানি ক্রমে উত্তরদিকে সরে আসছে। তার ফলে আগামরা রোগে বনের অনেক সুন্দরীগাছ মরে যেতে আরম্ভ করেছে।

সুন্দরবনে পানির লবণাক্ততা বেড়ে ওঠা অবশ্য চিংড়ি চাষের জন্য একটা নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। চিংড়ি চাষীরা ঘের দিয়ে নোনা পানি আটকে রাখছে; তাতে সে এলাকার গাছপালা এবং চাষবাসের জন্য আরো বিপদ সৃষ্টি হয়েছে। নোনা পানিতে সেখানকার জমি স্থায়ীভাবে গাছপালার জন্য বিষাক্ত হয়ে উঠছে। এ অঞ্চলের পরিবেশের অবনতি ঘটায় মাত্র এই শতাব্দীর মধ্যেই সুন্দরবনের চার প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে; এর মধ্যে রয়েছে এক প্রজাতির গণ্ডার, এক প্রজাতির বুনো মহিষ আর দু'প্রজাতির হরিণ।

সুন্দরবনের প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন পাশ হয় ১৯৭৩ সালে; তার পরের বছর এক সংশোধনীর মাধ্যমে সুন্দরবনে সব ধরনের শিকার নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু সুন্দরবনে গাছপালার সংখ্যা কমে আসায় এমনিতেই বাঘের জন্য উপযুক্ত আবাসভূমি এবং খাবার-দাবারের সমস্যা দেখা দিয়েছে। গাছপালা কমার ফলে সাধারণভাবে পরিবেশে আরো নানা পরিবর্তন ঘটেছে: যেমন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলোকপাত, হাওয়া, পানি সব কিছুতেই কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আর সে সব এ অঞ্চলের জীবজন্তুর ওপরে নানা ধরনের প্রভাব ফেলছে। তার ওপর রয়েছে শিকারীদের উৎপাত। শুধু বাঘ নয়, সুন্দরবনের পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় কয়েক ধরনের গিরগিটি, কচ্ছপ, অজগর, টেরাপিনও বিপন্ন বলে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু আইন থাকা সত্ত্বেও বাঘ শিকার বন্ধ করা যাচ্ছে না।

কিছু চোরা শিকারী ফাঁদ পেতে অথবা হরিণ মেরে তার গায়ে বিষ মিশিয়ে বাঘ শিকার করছে। তারপর সে বাঘের চামড়া, মাথা, চর্বি, নখ, দাঁত এসব মোটা রকম অর্থের বিনিময়ে বিদেশে পাচার করছে। বিদেশে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের শুধু একটি চামড়ার দামই নাকি ওঠে বাংলাদেশী মুদ্রায় তিন লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকা! এই বাঘের চামড়া ব্যবহার করা হয় ঘর সাজাবার জন্য; এছাড়া দাঁত, হাড়, চোখ, নখ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তথাকথিত ওষুধ তৈরির জন্য। চোরা শিকারীদের উৎপাতে অস্থির হয়ে বাঘ কখনো চলে আসে লোকালয়ে; তারপর সে বাঘের শিকার হয় গবাদি পশু, কখনো মানুষও। তখন গ্রামের লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আরো বাঘ হত্যা করে।

www.banglainternet.com

Goto List

সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা কত তার সঠিক হিসেব পাওয়া শক্ত। ১৯৬৭ সালে একটি জরিপ থেকে জানা যায় সে সময়ে বাঘের সংখ্যা ছিল মাত্র এক শ'। ১৯৭৫ সালে এক জরিপের ফলাফলে বলা বলা হয় বাঘের সংখ্যা তিন শ'। ১৯৮২ সালে আরেক জরিপে বলা হয় সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা সাড়ে চার শ'তে উঠেছে। কিন্তু ইতোমধ্যে সুন্দরবনে অপরিকল্পিতভাবে গাছপালা কেটে ফেলায় এবং আগামরা রোগে অনেক গাছ বিনষ্ট হওয়ায় গাছপালার ঘনত্ব কমে গেছে। তাতে চোরা শিকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে উঠেছে; বাঘের সংখ্যাও দ্রুত কমতে আরম্ভ করেছে। এখন বাঘের সংখ্যা তিন শ' থেকে চার শ'র মধ্যে হতে পারে।

বাঘের সংখ্যা যে শুধু বাংলাদেশে কমছে তা নয়। আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থার হিসেবে বলা হয়েছে সারা পৃথিবীতে এখন বাঘ আছে মোটামুটি ৫,০০০ থেকে ৭,০০০; মাঝামাঝি হিসেব নিয়ে ধরা যাক ৬,০০০। তার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ ৪,০০০-এর মতো) আছে ভারতে। বাঘের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠায় সে দেশে সরকারিভাবে একটি ব্যাঘ্র প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে; অনেক বনাঞ্চলকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে। তবু বাঘের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হতে পারছেন না। মাত্র এই শতাব্দীর চল্লিশের দশকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার বালি বাঘ, সত্তরের দশকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে কাস্পিয়ান বাঘ, আশির দশকে জাভা বাঘ। যে চীনে এক সময় প্রায় সারা দেশে বাঘ দেখা যেত সেখানে এখন বাঘের সংখ্যা এক শ'র নিচে নেমে এসেছে। কাজেই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আর বন নিধনের চাপে বাংলাদেশ আর ভারত এই দু'দেশেরই জাতীয় প্রাণী বাঘ যে আর কতদিন টিকে থাকতে পারবে তা বলা শক্ত।

এশিয়ার হাতিরা আজ বিপন্ন

হাতি হল ডাঙ্গার সবচেয়ে বড় প্রাণী; তার গায়ে শক্তিও প্রচুর। অনেক দেশে কাঠের শিল্পে বা দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ভারি বোঝা টানার জন্য হাতির শক্তিকে ব্যবহার করা হয় ব্যাপকভাবে। কিন্তু আজ হাতির এই শক্তি আর অধিকরী ব্যবহার তার অস্তিত্বের বিপন্নতাকে ঠেকাতে পারছে না। আফ্রিকার হাতিদের (*Loxodonta africana*) নিকেশ করা হচ্ছে তাদের বিশাল আর মূল্যবান দাঁতের জন্য। এশিয়ার হাতির (*Elephas maximus*) সাধারণত দাঁত হয় ছোট, তাও শুধু পুরুষগুলোর; তারা মারা পড়ছে বিপুল জনসংখ্যার চাপে।

হাতিরা সচরাচর গভীর জঙ্গলে বাস করে; তাই তাদের সংখ্যা খুব নিখুঁতভাবে গোনা রীতিমতো শক্ত। তবু বিজ্ঞানীরা হাতির সংখ্যার হিসেব করেছেন। তাঁদের হিসেবমতো এশিয়ায় হাতির সংখ্যা হতে পারে ৩৫,০০০ থেকে ৫৫,০০০—মাঝামাঝি একটা হিসেব নিয়ে ধরা যাক সংখ্যাটা ৪৫,০০০। এর মধ্যে মানুষের পোষা হল ১০,০০০ অর্থাৎ মানুষ এসব হাতিকে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি টানা ইত্যাদি কাজে লাগায়। ভারতে হাতির মোট সংখ্যা হবে প্রায় ২৫,০০০; বর্মায় দশ হাজারের কাছাকাছি; চীনে রয়েছে মাত্র শ'পাঁচেক। অথচ সে হিসেবে আফ্রিকায় হাতি আছে প্রায় পাঁচ লাখ।

www.banglainternet.com

Goto List

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি কশাইখানায় হাতির দাঁত কেটে চিহ্নিত করা হচ্ছে

www.banglainternet.com

Goto List

হাতিরা নানা বিচিত্র জাতের গাছপালা খেয়ে বেঁচে থাকে। মালয়েশিয়ার জঙ্গলে দেখা গেছে তারা প্রায় ৪০০ প্রজাতির উদ্ভিদ খায়; দক্ষিণ ভারতে এক জরিপে দেখা যায় এই সংখ্যাটি ১১২। অবশ্য হাতিদের বিশাল বপুর কারণে তাদের দৈনিক খাবার দরকার হয় প্রচুর। বয়স্ক একটি হাতির জন্য শুধু খাবার পানিই দরকার দৈনিক দু' শ' লিটারের ওপর। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সচরাচর গোটা বিশ মাদী হাতি মিলে একটি দল বাঁধে; তারপর এমনি ক'টি দল মিলে হয় তাদের একটি গোত্র। তাতে পুরুষ হাতিরাও যোগ দেয়। একেকটি গোত্রে থাকে ৫০ থেকে ২০০টি করে হাতি। গোত্রের হাতিরা একই বনে মোটামুটি এক সঙ্গে চরে বেড়ায়।

হাতিরা যেভাবে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে তাতে তাদের এক সঙ্গে অন্তত পঞ্চাশটি হাতি থাকা দরকার; কিন্তু ঠিকমতো বংশবৃদ্ধি আর নানা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার জন্য কোনো বনে এক সঙ্গে শ' পাঁচেক হাতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অথচ আজ জনসংখ্যার চাপে বন-জঙ্গলের পরিমাণ যেভাবে কমে যাচ্ছে তাতে এতগুলো হাতি এক সঙ্গে থাকা হয়ে উঠছে খুবই কঠিন। ভারতে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে সে দেশে প্রতিটি হাতির জন্য বনভূমি রয়েছে গড়ে মাত্র তিন বর্গ কিলোমিটার; এটা তাদের চরে বেড়াবার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। তার ওপর আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন দেশের জনসংখ্যা আজকের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে বনের পরিমাণ আরো কমে যাবে তখন হাতিদের জন্য আরো গুরুতর বিপদ দেখা দেবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভারতের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ ৮,০০০) হাতি আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পুবের পাহাড়ি এলাকায় যে মাত্র শ' তিনেক হাতি এখনও টিকে আছে তাদের অবস্থা রীতিমতো শোচনীয়।

অস্ট্রেলিয়ায় কোয়ালারাও

বাংলাদেশ আর ভারতে যেমন বাঘ হল জাতীয় পশু, চীনদেশে যেমন পান্ডা, তেমনি অস্ট্রেলিয়ায় হল কোয়ালা। কোয়ালারা অনেকটা ভালুক আর খরগোশের মাঝামাঝি চেহারার ছোট আকারের প্রাণী। বন্য অবস্থায় এরা খানিকটা হিংস্র, তবে পোষা কোয়ালা খুবই মিষ্টি চেহারার আর পুতুলের মতো দেখতে। এদের নাকটা কালো কুচকুচে লম্বাটে ধরনের, বুকটা সাদা, আর হালকা খয়েরি রঙের লোমে ঢাকা নাদুস নুদুস শরীর।

কোয়ালাদের যে বৈজ্ঞানিক নাম তাতেই এদের চেহারার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। নামটা হল *Phascolarctos* (থলেযুক্ত ভালুক) *cinereus* (ছাই রঙা) অর্থাৎ সবটা মিলিয়ে— ছাই রঙা থলেওয়ালা ভালুক। এরা এক ধরনের অতিমাত্রায় ঘুমকাতুরে বৃক্ষচারী প্রাণী; দিনরাতের ২০ ঘন্টাই প্রায় ঘুমিয়ে কাটায়। রাতের বেলা চরতে বেরোয়। এদের প্রধান খাদ্য হল বিশেষ বিশেষ জাতের ইউক্যালিপ্টাসের পাতা; তাই এদের সারা গায়ে যেমন তেমনি বিষ্ঠাতেও ইউক্যালিপ্টাস তেলের কড়া গন্ধ। ইউক্যালিপ্টাস গাছের জাত রয়েছে ছ'শ'র ওপরে। তার মধ্যে মাত্র দশ-পনের প্রজাতি হল কোয়ালাদের পছন্দ। এগুলো সাধারণত ত্রিশ ফুটের মতো লম্বা হয়, আর পাতা হয় প্রচুর। এক একটি কোয়ালা খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে প্রতি রাতে সাবাড় করে এক থেকে তিন পাউন্ড পরিমাণ পাতা।

www.banglainternet.com

Goto List

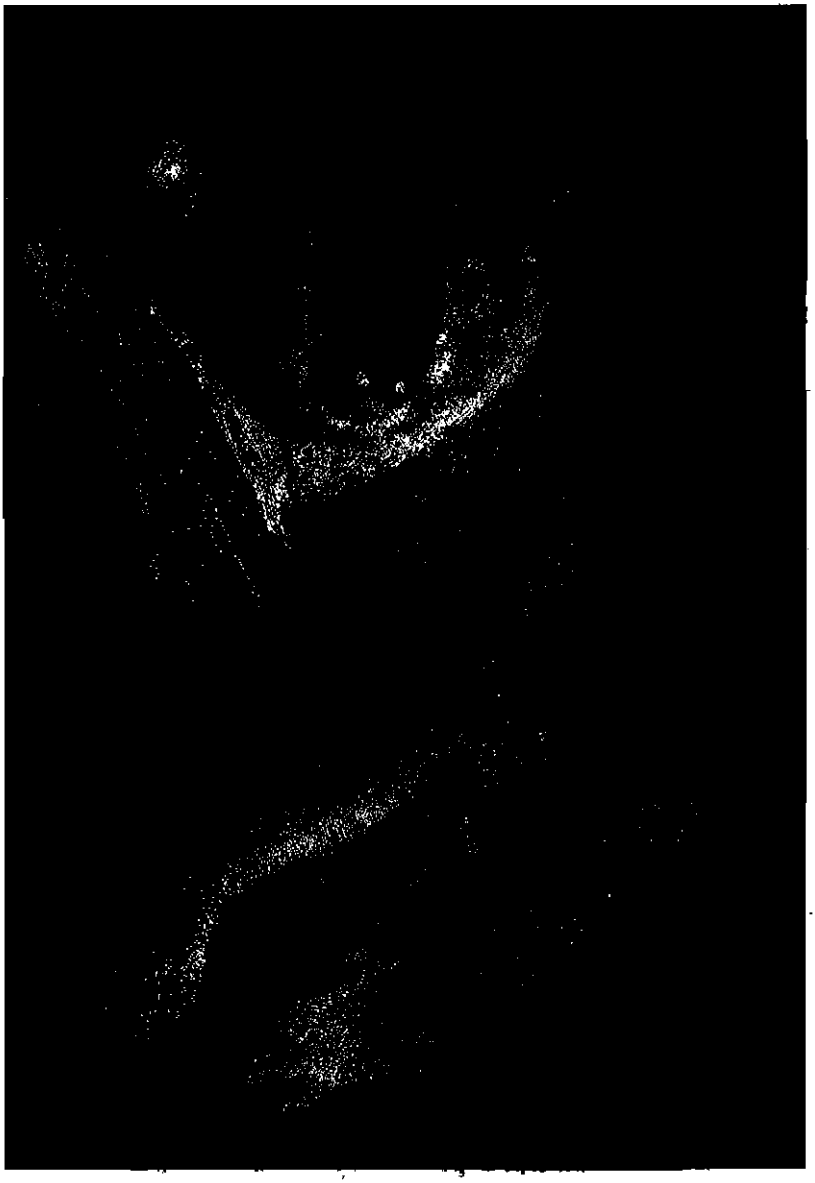

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় পশু কোয়ালারা আজ বিপন্ন

www.banglainternet.com

Goto List

অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলের কুইন্সল্যান্ড, নিউ সাউথ ওয়েলস্ আর ভিক্টোরিয়া প্রদেশের উপকূলীয় বনভূমিতে যে এলাকায় এসব জাতের ইউক্যালিপ্টাস পাওয়া যায় সেখানেই কোয়ালাদের প্রধান আবাস । কিন্তু সমস্যা হল মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এ ধরনের বনভূমির পরিমাণ দ্রুত কমে আসছে; আর তাই কোয়ালাদের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগে একটা জরিপে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ায় কোয়ালা রয়েছে প্রায় চার লাখ; ১৯৯৩ সালে আরেক জরিপে বলা হয়েছে এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র চল্লিশ হাজারে। ইতোমধ্যে ১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ ইউনিয়ন (IUCN) অস্ট্রেলিয়ার অনেকগুলো প্রাণীকে বিপন্ন ঘোষণা করেছে, তাদের মধ্যে কোয়ালাও রয়েছে।

উনিশ শতকের শুরুতে ইউরোপীয়রা যখন অস্ট্রেলিয়ায় বসত গাড়তে আরম্ভ করে তখন তাদের একটা অতি লাভজনক রপ্তানি হয়ে ওঠে কোয়ালার তুলতুলে লোমযুক্ত চামড়া। ইউরোপের অভিজাত রমণীরা তাঁদের পোশাকের জন্য এই ফার দারুণ পছন্দ করতেন। বিশ শতকে এসে কোয়ালা নিধন এমন বীভৎস রূপ নেয় যে, ১৯২৭ সালে সরকারিভাবে কোয়ালার চামড়া রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু আজ যে কোয়ালার সংখ্যা কমে যাচ্ছে সেটা যতটা না কোয়ালা নিধনের কারণে তার চেয়ে বেশি মানুষের আবাস আর কাঠের জন্য বন-জঙ্গল কেটে ফেলায় কোয়ালাদের বাঁচা কঠিন হয়ে উঠছে বলে। সারা অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে তার দক্ষিণ-পুব এলাকায় জনসংখ্যা বাড়ছে সব চাইতে দ্রুত। আর এ অঞ্চলেই হল কোয়ালাদের প্রধান আবাসভূমি। তাই আজ কোয়ালারা শ'য়ে শ'য়ে মরছে সড়কপথে গাড়ি চাপা পড়ে, কুকুরের শিকার হয়ে আর লোকালয়ে দুষ্টু ছেলেদের হাতে পড়ে।

অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ মানুষদের মনে কোয়ালা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা এক বিরাট উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। সে দেশে ১৯৯২ সালে বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ আইন পাশ হয়েছে। কিন্তু আইন থাকার চেয়েও বড় কথা হল কিভাবে তার প্রয়োগ হচ্ছে। কোয়ালাদের আবাস রক্ষার ব্যবস্থা যদি এখনই করা না হয় তাহলে এর বিলুপ্তিকে হয়তো শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যাবে না। এই মহাদেশে আধুনিক কালে ইতোমধ্যে অন্তত বিশটি স্তন্যপায়ী প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে; তার সঙ্গে আর একটি যোগ হবে মাত্র!

শুধু আজকের প্রজন্মের জন্য নয়

জীবজগতের বৈচিত্র্য এ পৃথিবীকে আরো বেশি বাসযোগ্য করে তোলে। জীবজগতের ভারসাম্য বজায় থাকলে শুধু যে চারপাশের পরিবেশের রাসায়নিক ভারসাম্য রক্ষা হয় তাই নয়, জলবায়ু, মাটি-পানির ভারসাম্যও বজায় থাকে। এমনি ভারসাম্য বজায় থাকলে প্রতিটি জীব অন্য অনেক জীবের জীবন যাপনে সহায়ক হয়ে ওঠে; অন্যের জীবনকে ঐশ্বর্যময় করে তোলে। একের বিলুপ্তিতে তাই আরো অনেকের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে।

www.banglainternet.com

Goto List

জীবজগতের বৈচিত্র্য এ পৃথিবীর এক অমূল্য সম্পদ। আমাদের সকল খাদ্য এবং অধিকাংশ কাঁচামাল জীবজগৎ থেকেই আসে। কৃষিজাত পণ্য ছাড়াও বিপুল পরিমাণ ওষুধপত্র এবং শিল্পজাত বস্তু উৎপন্ন হয় জীবজগৎ থেকে। এসব ব্যবহারিক চাহিদা পূরণ ছাড়াও জীবজগৎ আমাদের যে বিপুল সাংস্কৃতিক ও মনোগত চাহিদা মেটায় তার দামও কম নয়।

নানা জীবপ্রজাতির বিলুপ্তি শুধু যে আমাদের কালের বা আমাদের প্রজন্মের জন্যই ক্ষতিকর তা নয়, আগামী দিনের সকল প্রজন্মের জন্যও তা বিপুল ক্ষতির বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। যেসব প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হচ্ছে তার অনেকগুলোর মধ্যেই খাদ্য, ওষুধ বা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে নানা অজানা সম্ভাবনা লুকানো রয়েছে । পরিবেশের অবনতির ফলে যেসব বাস্তুসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেগুলো শুধু নানা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য নয়, মানুষের বসবাসের জন্যও অনুপযোগী হয়ে উঠছে। নানা বিচিত্র প্রজাতির ফসলের পরিবর্তে মাত্র কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির ফসলের ওপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হবার ফলে ভবিষ্যতে উন্নত গুণাগুণযুক্ত ফসল সৃষ্টির সম্ভাবনাও নষ্ট হচ্ছে।

আগামী দিনে যখন মানুষের সংখ্যা আরো বাড়বে তখন পৃথিবীর ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদা মেটাবার জন্য নতুন নতুন গুণাগুণযুক্ত নানা নতুন ধরনের ফসল উদ্ভাবন করতে হবে। উচ্চ উৎপাদনশীলতা, খরা বা উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা, রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি—এমনি সব গুণাগুণ লুকানো আছে আজকের অনেক উদ্ভিদ আর প্রাণীর মধ্যেই, তাদের জিনকণার সঞ্চয়ের মধ্যে। এই জিন সম্পদের ভাণ্ডার আগামী বহু প্রজন্মের জন্য যে কোন মূল্যে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু আজ যেভাবে দুনিয়া জুড়ে প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে এবং জীবজগতের বৈচিত্র্য বিনষ্ট হচ্ছে তার জন্য দায়ী কে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে উত্তরটা তেমন কঠিন বা জটিল নয়। মানুষের সংখ্যা বাড়ার ফলে ব্যাপক আকারে বন-জঙ্গল কেটে বা পুড়িয়ে ধ্বংস করা হচ্ছে, উদ্ভিদ বা প্রাণী অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করে নিঃশেষ করা হচ্ছে; কীটনাশক, আগাছানাশক প্রভৃতি রাসায়নিক বস্তু বেহিসেবীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে; বেহিসেবী মাছ ধরা, অতিরিক্ত রকম বায়ু ও পানিদূষণ—এসব কিছুকেই কারণ বলে নির্দেশ করা যেতে পারে।

কিন্তু একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে আসলে এসবের পেছনে রয়েছে মানুষের বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধি, বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক প্রবণতা। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাঠ, আঁশ, খাদ্যশস্য, বন্যপ্রাণী প্রভৃতি নানা পণ্যদ্রব্য ভোগের চাহিদা বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প রচনায় খনিজ প্রভৃতি অজৈব বস্তুর মূল্য যতটা ধরা হয় সে তুলনায় জীবসম্পদের আর্থিক মূল্য কম ধরা হয়। আবার অন্যদিকে জীবসম্পদ ধ্বংস করা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের জন্য বিপুল মুনাফা সৃষ্টি করে, অথচ তাতে স্থানীয় জনগণ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষের জীবনে অনেক জীবপ্রজাতির প্রভাব সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এখনও সীমাবদ্ধ। প্রায়শ পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোও নেহাতই দুর্বল।

www.banglainternet.com

Goto List

অনেক সময় উত্তর-দক্ষিণের অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নটিও এখানে প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীর জীবপ্রজাতির বেশির ভাগের বাস দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত নিরক্ষীয় অঞ্চলে। অথচ এসব সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে প্রধানত উত্তরাঞ্চলের শিল্পোন্নত দেশগুলোর মানুষদের ভোগের জন্য। সস্তা শ্রম, কাঁচামালের কম দাম, অসম মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগ প্রভৃতি কারণে দক্ষিণের দেশগুলোর অর্থনীতি যেমন ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের পরিবেশের সম্পদ। এ সমস্যার সমাধানের জন্য তাই যেমন আশু এবং আপাতদৃষ্ট সমস্যাগুলোর দিকে তাকাতে হবে, তেমনি এর গভীরে যেসব অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা রয়েছে সেগুলোর কথাও ভাবতে হবে।

এই শতাব্দীর শুরুতে ভারতের বন এলাকা ছিল দেশের মোট এলাকার প্রায় ৪০ শতাংশ; আজ তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৫ শতাংশ। তার মধ্যে তিন শতাংশকে নির্ধারণ করা হয়েছে বন্য প্রাণীর জন্য সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে। বাংলাদেশে শতাব্দীর শুরুতে বনের এলাকা ছিল প্রায় ৩০ শতাংশ; আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ। আর সংরক্ষিত বনাঞ্চল দেশের মোট এলাকার এক শতাংশের অর্ধেকও নয়। এ অবস্থায় আমাদের প্রজাতি সম্পদ রক্ষার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেবার কথা এখনই ভাবতে হবে; কেননা এক্ষেত্রে বিলম্ব হবে আত্মঘাতী।

www.banglainternet.com

Goto List

লবঙ্গ–এলাচের সুরভি ও প্রজাতির উৎস

আজ বাগদাদ ডাকে কোথা বহু দূরে!
যাব স্রোত ফুঁড়ে যাব সব বাঁক ঘুরে
হাতীর হাড়ের সওদা নিয়েছি, নিয়েছি কাবাব-চিনি,
আলমাস আর গওহর দিয়ে বেশাতি ক'রেছি পুরা
শেষ ক'রেছি এ পিপুল, মরিচ, এলাচের বিকি-কিনি;
কিশ্‌তীর মুখ ফেরাও এবার দরিয়ার বন্ধুরা। ...

- ফররুখ আহমদ (দরিয়ায় শেষ রাত্রি)

বাগদাদের স্বপ্নচারী কবি ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্যের জগতে বারবার যে সাত সাগরের মাঝি আর নোনা দরিয়ার রূপ দেখেছেন সে তো আজকের নোনা দরিয়া নয়। এ হল আজ থেকে পাঁচ শ' কি হাজার বছর আগের নোনা দরিয়া যেখানে আরব সওদাগররা হরেক রকম সওদা নিয়ে বেরোতেন দেশ-দেশান্তরে। আর ফিরতেন নানা মণিমানিক্যের বোঝা নিয়ে। ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে ভারত মহাসাগরে চলাচল করত তাঁদের বাণিজ্য বহর। এমনি অনেক আরব বণিক বাণিজ্য করতে এসে স্থায়ী বসত গেড়েছিলেন ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকটে। এ এলাকায় জন্মাত প্রচুর মসলা, যার দারুণ চাহিদা ছিল ইউরোপের বাজারে। লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোট এলাচ, জায়ফল এমনি নানা ধরনের মসলা জন্মাত আরো পুবে—মোলাক্কা, জাভা এসব দ্বীপেও। ভারতীয় আর মালয়-পলিনেশীয় বণিকরা এসব মসলা যোগাড় করে এনে বেচতেন আরব বণিকদের কাছে।

ইউরোপের ঠাণ্ডা জলবায়ুতে এমনিতে গাছপালার জাত কম, তার মধ্যে মসলার নাম-নিশানা নেই। অথচ মসলা ছাড়া মাছ-মাংস বিস্বাদ; খাওয়ার মজাই মাটি। মসলা বাড়ায় খাবারের স্বাদ, তেমনি তার মনোরম সৌরভ বহু গুণে বাড়িয়ে তোলে খাওয়ার তৃপ্তি। নানা দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ার ফলে ইউরোপের লোকদের আয়-উন্নতি বাড়ছিল, সেই

www.banglainternet.com

Goto List

সঙ্গে খাবারে মাছ-মাংসের পরিমাণও। সেকালে শীতের দেশে মাংস জমিয়ে রাখতে হত শুকিয়ে বা নুন দিয়ে; সে বিস্বাদ মাংস মসলা ছাড়া কারো মুখে রোচে না। অথচ মসলাপাতি সবই যোগাড় করতে হয় পুবের দেশ থেকে। পুবের এসব দেশ যে কোথায় তা কেউ জানে না; সেসব দেশ থেকে মসলা আসে বহু দূরের পথ পেরিয়ে, অনেক হাত ঘুরে। আর ইউরোপের বাজারে সে মসলা বিকোয় যেন সোনার দামে! তাই তাদের কাছে পুবের দেশ মানে হল স্বপ্নের দেশ। ইউরোপের সব দেশের বণিকেরা স্বপ্ন দেখে পুবের দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করে মুনাফার পাহাড় তৈরির। রাজ-রাজড়ারা স্বপ্ন দেখে এলাচ-লবঙ্গের সুরভিমাখা সোনাদানায় মোড়া সে সব দেশে তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তোলার; পাদ্রী-মোহান্তরা স্বপ্ন দেখে সে সব দেশের মানুষদের সবাইকে তাদের শিষ্যের দলে নাম লেখাবার।

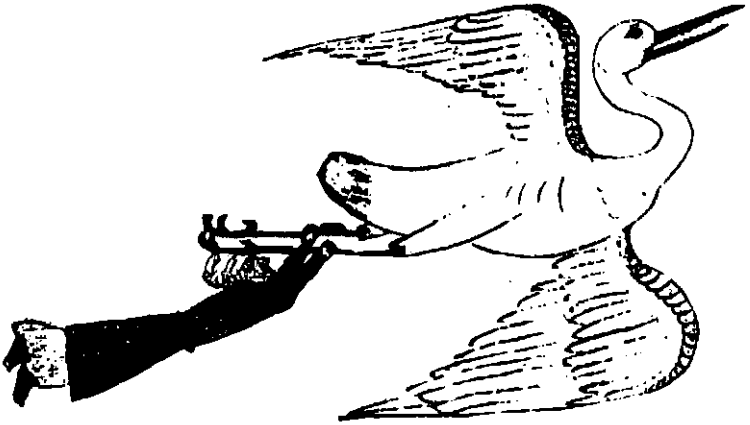

দূরদেশে আরব বণিককে বিপদ থেকে উদ্ধার করছে রক-পাখি (চতুর্দশ শতকের ইরাকী পাণ্ডুলিপি 'আজাইব আল-মাখলুকাত' (বিশ্বের বিস্ময়)-এর চিত্রসজ্জা

ইউরোপ আর এশিয়ার মধ্যে মসলার বাণিজ্য যে কতকালের তা বলা শক্ত। দু'আড়াই হাজার বছর আগে রোমান যুগেও শোনা যেত অকূল দরিয়ার বুকে দক্ষিণ-পুব এশিয়া আর আফ্রিকার মধ্যে এক 'দারুচিনি সড়ক' আছে। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে রোমক পণ্ডিত প্লিনি বলেছিলেন, ইথিওপিয়া থেকে আমরা যে দারুচিনি পাই তা আসে আরো পুবের বহু দূরের নানা দ্বীপ থেকে —হাল-দাঁড়হীন, পালহীন সব ভেলায় করে ভেসে ভেসে এসব সওদা পৌঁছত আফ্রিকার উপকূলে। সূর্যের দক্ষিণায়নের সময় তীব্র পুবের হাওয়া সে সব ভেলাকে ঠেলে নিয়ে যেত মালদ্বীপ ছাড়িয়ে আফ্রিকার পুব-উপকূলের দিকে। তারপর দক্ষিণ-পুব হাওয়া তাদের নিয়ে যেত আফ্রিকার উপকূলে মাদাগাস্কারের উত্তরে। লোহিত সাগরের তীর থেকে আরব বণিকদের মাধ্যমে হাত বদল হতে হতে সে সব পৌঁছে যেত নীলনদের উপত্যকায়; তারপর ইউরোপে।

www.banglainternet.com

Goto List

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় বনে মিলত নানারকম ওষুধপত্র, মসলাপাতি; সেই সঙ্গে ব্যবসা চলত ধাতু আর বস্ত্রের। মালয়-ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের মসলা প্রাচীনকালে প্রথমে জড়ো হত জাভায়, সেখান থেকে স্থানীয় বণিকরা নিয়ে যেত চীনে। তারপর স্থলপথে যেত আরো নানা দেশে। দশম শতাব্দীর পর সরাসরি মসলার খোঁজে সমুদ্রপথে এসে হাজির হল চীনা, ভারতীয় আর আরব বণিকরা। এ এলাকায় জমজমাট ব্যবসা গড়ে উঠল সুগন্ধিদ্রব্য, ওষুধপত্র, রেশম, ভারতীয় তুলা, চীনামাটির বাসনকোসন আর মসলার। ১৩-১৫ শতক পর্যন্ত এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত জাভার বণিকরা; তারপর আরব, ভারতীয় আর চীনা বণিকরা এই বাণিজ্যে সরাসরি এগিয়ে আসে।

ভেনিসের পর্যটক মার্কো পোলো ১২৯২ সালে লিখেছেন, আমাদের মরিচ আর আদা আমদানি হয় ভারত থেকে। কিন্তু তখন ভারত পর্যন্ত পৌঁছনো খুব কঠিন। এক পথ হল মিসরের ভেতর দিয়ে, আরেক পথ পারস্যের ভেতর দিয়ে। দুটো পথই বেশ দুর্গম। তখনও সরাসরি সমুদ্রপথে ভারতে আসা যায় না। ভারতের মালাবার উপকূলের বনাঞ্চল থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বেশির ভাগ মসলা যেত ইরান উপসাগর আর লোহিত সাগর হয়ে। এদিকে ক্রুসেডে খ্রিষ্টানদের হার হওয়ায় ইউরোপের লোকদের জন্য মুসলিম মিসরের ভেতর দিয়ে বাণিজ্যপথটা মোটেই সুগম নয়। যদি জলপথে কোনমতে ভারতে পৌঁছনো যায় তাহলে দুর্মূল্য মসলা আর মণিমুক্তার ঝলমলে জগৎটাকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

১৪৮৪ সালে জেনোয়ার নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস ভারতীয় মসলার স্বপ্ন দেখতে দেখতেই তাঁর বিপদসংকুল আর দুঃসাহসিক সাগর যাত্রার পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি ভারতে পৌঁছতে পারেন নি, ১৪৯২ সালে ভুল করে হাজির হয়েছিলেন আমেরিকার উপকূলে। সে ভুলের সাক্ষী হিসেবে আজও সে এলাকার দ্বীপগুলোর নাম হয়ে আছে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

আমরা সচরাচর যে সব ইতিহাস পড়ি তাতে প্রচুর যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী থাকে। কাদের কাদের মধ্যে লড়াই হয়েছিল, কি নিয়ে বেধেছিল লড়াই, কতদিন চলেছিল, কারা জিতেছিল, কিভাবে জিতেছিল সে সব কাহিনীতে ভরা থাকে ইতিহাসের পাতা। সচরাচর লড়াই বাধে জমিজমা, ধন-দৌলত নিয়ে, কখনো সুন্দরী নারী নিয়েও। কিন্তু উদ্ভিদের প্রজাতি নিয়ে লড়াই? ভাবতেও যেন কেমন লাগে। অথচ এমন লড়াই ইতিহাসে একেবারে কম হয় নি। ষোল-সতের শতক জুড়ে দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মসলার দখল নিয়ে বেধেছে এমনি প্রচুর লড়াই। এদেশের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সত্যেন সেন এ ধরনের লড়াইয়ের কাহিনী নিয়ে 'মসলার যুদ্ধ' নামে একটি বইও লিখেছেন।

কোথায়, কখন, কাদের মধ্যে, কতদিন ধরে চলেছে এসব যুদ্ধ? সেসব কথা জানবার আগে জানা দরকার জীবপ্রজাতি বলতে আমরা কি বুঝি; কতগুলো প্রজাতি আছে পৃথিবীতে, আর সেসব আমাদের কি ধরনের কাজেই বা লাগে!

www.banglainternet.com

Goto List

জীবপ্রজাতির কথা

এ পৃথিবীতে যখন প্রথম জীবনের আবির্ভাব ঘটেছিল তখন খুব সম্ভব সে জীব ছিল খুব সরল ধরনের। সে তুলনায় আজকের পৃথিবীতে বহু বিচিত্র ধরনের জটিল জীবের উদ্ভব ঘটেছে। এদের জাত বিচার করে সাজাবার চেষ্টা করে আসছে মানুষ সেই আদি কাল থেকে। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) জীবজগতকে ভাগ করেছিলেন দু'ভাগে: তার একভাগ হল প্রাণিজগৎ যাদের চলাচলের ক্ষমতা আছে আর অনুভূতি আছে; যাদের চলাচল নেই বা অনুভূতি নেই তাদের তিনি ফেললেন উদ্ভিদের দলে।

প্রাচ্যদেশে বাণিজ্যবহর: মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনীর চিত্রসজ্জা
(১৫শ শতকের ফরাসী অনুবাদগ্রন্থ থেকে)

www.banglainternet.com

Goto List

প্রায় দু'হাজার বছর ধরে অ্যারিস্ট্লের এই শ্রেণীবিভাগ নিয়ে কেউ তেমন কোন প্রশ্ন তোলে নি। অ্যারিস্টট্ল মাত্র ৫০০ জাতের প্রাণীর খোঁজ করতে পেরেছিলেন। আর তাঁর শিষ্য সেকালের সেরা উদ্ভিদবিদ থিওফ্রেস্টাস (Theophrastus. আনুমানিক ৩৭২-২৮৭ খ্রি.পূ.) হদিস করতে পেরেছিলেন মাত্র ৫০০ জাতের উদ্ভিদের। কিন্তু পনের-ষোল শতকে ইউরোপীয় নাবিকরা নতুন নতুন দেশে সফর করে নানা বিচিত্র উদ্ভিদের খবর নিয়ে আসতে লাগল। দেখা গেল উদ্ভিদজগৎ আগে যা ভাবা হয়েছিল তার চেয়ে আসলে ঢের বড়; অ্যারিস্টট্লের সাদামাটা ভাগ দিয়ে আর চলছে না।

তাছাড়া দেখা গেল শুধু চেহারা দেখে জাত বিভাগ করতে গিয়ে সুবিধে হচ্ছে না। যেমন-সব হাতি বা সব উট কি একই জাতে ফেলা যাবে? ভারতীয় হাতি আর আফ্রিকার হাতির মধ্যে প্রজনন হয় না। তেমনি এক কুঁজওয়ালা আরবী উট আর দু'কুঁজওয়ালা ব্যাকট্রিয়ান উটের মধ্যেও প্রজনন হয় না। কাজেই বোঝা যাচ্ছে আসলে এরা ঠিক এক প্রজাতি নয়। অর্থাৎ জাত ভাগ করতে হলে তা করতে হবে পারস্পরিক প্রজনন হয় কি না তার বিচারে।

উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজন বেশি করে দেখা গেল নানা রোগের চিকিৎসায় গাছগাছড়ার ব্যবহারের কারণে। আঠার শতকে ক্যারোলাস লিনিয়াস (*Carolus Linnaeus*, ১৭০৭-৭৮) নামে সুইডেনের এক ডাক্তার প্রথম একটা বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিভাগের নকশা তৈরি করলেন। কর্মজীবনের শুরুতে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ল্যাপল্যান্ডের বিজন আর দুর্গম বনে বনে প্রায় চার হাজার মাইল ঘুরে—তার বেশির ভাগই পায়ে হেঁটে—তিনি অনেক নতুন উদ্ভিদ আর প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। ফুল যে উদ্ভিদের প্রজননের অঙ্গ এ ধারণা বিজ্ঞানীদের মধ্যে তখন নতুন চালু হয়েছে। লিনিয়াস দেখলেন একই জাতের উদ্ভিদের ফুলে পুংকেশরের সংখ্যা সব একই রকম। ফুলের পুংকেশর আর গর্ভদণ্ডের ভিত্তিতে এসব শ্রেণী বিভাগের নকশা নিয়ে ১৭৩৫ সালে তিনি একটা বই লিখলেন, তার নাম *Systema Naturae* অর্থাৎ প্রকৃতির বিন্যাস; ১৭৫৩ সালে বেরলো তাঁর আরেক বই, নাম *Species Plantarum* অর্থাৎ উদ্ভিদের প্রজাতি। তাঁর এসব বই এমন আলোড়ন সৃষ্টি করল যে, নামকরণের জন্য দুনিয়ার নানা জায়গা থেকে তাঁর কাছে অজস্র নতুন নতুন জাতের গাছপালার নমুনা আসতে শুরু করল। তাঁর অসংখ্য শিষ্য গাছপালার সন্ধানে নানা দেশের দুর্গম এলাকায় অভিযানে বেরলো; তাদের অনেকে মধ্যপ্রাচ্যের মরুপ্রান্তরে আর আফ্রিকার জলায় প্রাণও দিল।

লিনিয়াস যে সব উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রজাতির মধ্যে বেশ মিল আছে তাদের একসঙ্গে করে নাম দিলেন 'গণ'। তারপর প্রতি প্রজাতির নামকরণ করলেন দু'শব্দে—প্রথম শব্দে বোঝায় এটা কোন্ গণ-এর, দ্বিতীয় শব্দে বোঝায় কোন্ প্রজাতি। সেকালে সব শিক্ষিত লোকের সাধারণ ভাষা ছিল ল্যাতিন, তাই এই নামকরণ করা হয় ল্যাতিন ভাষায়। যেমন মানুষ একটা প্রজাতি; এর নাম হল *Homo sapiens* (অর্থাৎ নর, জ্ঞানী)। তিনি ওরাংওটাঙ-এর নামকরণ করলেন *Homo troglodytes* (অর্থাৎ নর, গুহাবাসী)। তবে এত সব শ্রেণীকরণ করলেও

www.banglainternet.com

Goto List

লিনিয়াস বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল সব প্রজাতি গোড়ায় যেভাবে সৃষ্টি হয়েছিল বরাবর ঠিক সেভাবেই রয়েছে; এযাবৎ কোন প্রজাতির বিলুপ্তিও ঘটে নি। কিন্তু শ্রেণী বিভাগ করতে করতে দেশে দেশে এত বিচিত্র রকমের উদ্ভিদ আর প্রাণীর উৎপত্তি কিভাবে হল তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে লাগল। এসব প্রশ্নের মীমাংসা উনিশ শতকের আগে করা সম্ভব হয় নি।

জীবজগতের আধুনিক শ্রেণীবিন্যাসের জনক সুইডিশ চিকিৎসক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস

www.banglainternet.com

Goto List

আগেই বলেছি অ্যারিস্টট্‌লের সময়ে গ্রীকদের জানা সব উদ্ভিদ আর প্রাণী মিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র হাজারখানেক। ১৮০০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াল ৭০,০০০। আজ এই সংখ্যা ধরা হয় মোটামুটি পনের লাখ; তার মধ্যে উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ, আর প্রাণীর সংখ্যা ১১ লাখ। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন নিরক্ষীয় অঞ্চলের বিজন বনে, কীটপতঙ্গ আর অমেরুদণ্ডীদের মধ্যে আরো অসংখ্য প্রজাতি আজো রয়েছে মানুষের হিসেবের বাইরে। তাদের সংখ্যা যোগ করলে মোট প্রজাতির সংখ্যা এক কোটি থেকে তিন কোটির মতো হতে পারে।

এত রকম প্রজাতি যে সব দেশে সমান ভাবে ছড়িয়েছে তা তো নয়। এক এক দেশের জলবায়ুর প্রভাবে জন্মেছে এক এক জাতের উদ্ভিদ। তারপর মানুষ যখন তার অর্থনৈতিক মূল্যের খোঁজ পেয়েছে তখন তাকে নিয়ে গেছে তার নিজ দেশে বা আর কোন ভিন্ন দেশে। যেমন কফির উৎপত্তি আফ্রিকায়; সেখান থেকে অভিযাত্রীরা তাকে নিয়ে গেছে এশিয়ায় আর আমেরিকায়। আলু গোড়ায় জন্মাত দক্ষিণ আমেরিকায়; সেখান থেকে স্পেনীয় নাবিকরা তাকে নিয়ে যায় ইউরোপে; সেখান থেকে আমেরিকায় যায় সতের শতকের মাঝামাঝি। আনারসের উৎপত্তি মধ্যআমেরিকায়; সেখান থেকে তা গিয়ে পৌঁছেছে এশিয়া, আফ্রিকা এবং আরো নানা দেশে। রাবারের উৎপত্তি দক্ষিণ আমেরিকায়। ব্রাজিল থেকে ১৮৭৫ সালে এক ইংরেজ গোপনে রাবার বীজ নিয়ে যায় বিলেতে। তা থেকেই শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠেছে আজকের সিংহল, মালয়েশিয়া আর ইন্দোনেশিয়ার রাবার শিল্প।

নানা জাতের অর্থকরী গাছপালা-নানা দেশের অর্থনীতিতে যেমন প্রভাব ফেলেছে তেমনি ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর রাজ্য জয়ের নেশাতেও কম প্রভাব বিস্তার করে নি। আর তার মধ্য দিয়ে অসংখ্য নাবিক, অভিযাত্রী, বণিক আর পাদ্রীও দুনিয়া জুড়ে অনেক উদ্ভিদের বিস্তার ঘটিয়েছে।

মসলার দখল নিয়ে লড়াই

মসলার খোঁজে ইউরোপ থেকে ভারতে প্রথম এসে হাজির হল পর্তুগিজরা। পঞ্চদশ শতকে পর্তুগালের রাজার ভাই প্রিন্স হেনরি ছিলেন সমুদ্রযাত্রার ব্যাপারে খুব উৎসাহী। তাঁর চেষ্টায় লিসবনে গড়ে ওঠে নাবিকদের জন্য একটা শিক্ষাকেন্দ্র। এসব প্রশিক্ষিত নাবিক নিয়ে ১৪৮৭ সালে বার্তোলেমিউ দিয়াজ আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারত মহাসাগরে ঢোকার পথ আবিষ্কার করলেন। তার দশ বছর পর ১৪৯৭ সালে সে দেশের নাবিক ভাস্কো দা গামা সমুদ্রপথে কামানসজ্জিত চারটি জাহাজের বহর নিয়ে ভারতের দিকে রওনা দিলেন; দশ মাসের মাথায় তাঁর বহর দক্ষিণ ভারতের কালিকট উপকূলে এসে হাজির হল। কালিকটের শাসনকর্তা জামোরিন-এর কাছ থেকে তাঁরা সেখানে মসলার ব্যবসা করার অনুমতি সহজেই পেয়ে গেলেন। পর্তুগালের একটা বাণিজ্যঘাঁটিও সেখানে বসানো হল। কিন্তু তারা দেখল সেখানে আরব বণিকরা আগে থেকে প্রভাব বিস্তার করে আছে; তাদের

www.banglainternet.com

Goto List

প্রভাব কমাতে না পারলে ব্যবসায় তেমন সুবিধে করা যাবে না। তাই পর্তুগিজরা সেখানে আরো অস্ত্রসজ্জিত যুদ্ধজাহাজ নিয়ে এলো আর নানা ছলছুতায় একটা হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করতে লাগল। পরিকল্পনামতো একদিন পর্তুগিজ অধিনায়ক কাব্রাল নগরের ওপর কামান দাগতে শুরু করল। কালিকটের কাছে কামান ছিল না; কিন্তু তবু সেখানকার হিন্দু-মুসলমান নাগরিকদের মিলিত প্রতিরোধের মুখে তাকে পরাজয় মেনে হটে যেতে হল। এবার ভাস্কো দা গামার নেতৃত্বে পর্তুগালের যুদ্ধবহর এসে হাজির হল। কিন্তু তাতেও পর্তুগিজ বাহিনীর হার হল।

পর্তুগিজরা কালিকটের খানিকটা দক্ষিণে কোচিনে একটা স্থায়ী ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। সেখান থেকে প্রচুর কামান এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আরেক পর্তুগিজ বহর এসে হাজির হল। কালিকটের শাসনকর্তা জামোরিন বিপদ দেখে মিসরের কাছে সাহায্য চাইলেন; মিসর মীর হুসেন নামে এক সেনাপতির অধীনে কিছু সৈন্য আর অস্ত্রসজ্জিত জাহাজ পাঠালেন। তাঁরা গুজরাটের মধ্যে দিউ দ্বীপে ঘাঁটি করলেন। কিন্তু এ সময়ে দিউ-এর শাসক বিশ্বাসঘাতকতা করে রসদ বন্ধ করে দেওয়ায় মিসরের সেনাপতি বিরক্ত হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। কালিকটের সেনাদের হার হল। ভারত সাগরে পর্তুগাল একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসল। ১৫১০ সালে তারা গোয়া বন্দর দখল করে নিয়ে সেখানে তাদের প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করল। এর ফলে তারা প্রায় দেড় শ' বছর ধরে ইউরোপের মসলার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। ক্যাথলিক পর্তুগিজরা ছিল প্রচণ্ড রকম মুসলিমবিদ্বেষী; স্থানীয় মুসলিম বাসিন্দাদের ওপর তারা অকথ্য অত্যাচার করে যেতে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যেই পর্তুগিজরা দেখল ভারতের চেয়ে মসলা বেশি জন্মায় ইন্দোনেশিয়ায়; তখন তারা সেখানকার মসলা বাণিজ্যও কব্জা করার মতলব আঁটল। পর্তুগিজ সেনাপতি আলবুকার্ক ১৫১১ সালে আঠারোটা রণতরী নিয়ে মসলাদ্বীপ মোলাক্কায় এসে হাজির হলেন। সেখানে তারা নির্বিচারে কামানের গোলা বর্ষণ করতে লাগল, তারপর ব্যাপকভাবে লুটতরাজ আর মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ চলল। এভাবে কামানের জোরে পর্তুগিজরা মোলাক্কাকে আর ইন্দোনেশিয়ার মসলা বাণিজ্যকে তাদের কুক্ষিগত করে ফেলল। এরপরও কালিকট, ক্যাম্বে আর তুরস্কের মধ্যে পর্তুগালের সঙ্গে লড়বার জন্য একটা চুক্তি হয়েছিল। মিসর তখন তুরস্কের অধীন; তুর্কী সুলতানের নির্দেশে মিসরের শাসনকর্তা সুলেমান পাশা ১৫৩৮ সালে একটি সেনাবাহিনীও পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু পর্তুগিজদের কামানের গোলার সামনে তারা টিকতে পারে নি। তার ফলে ১৫৯৯ সাল পর্যন্ত সমুদ্রে পর্তুগালের অপ্রতিহত আধিপত্য বজায় থাকে।

পর্তুগালের এভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের পেছনে রোমের পোপের সমর্থন ছিল। কিন্তু ইউরোপে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে আরম্ভ করেছিল। মার্টিন লুথার ইউরোপে প্রোটেস্ট্যান্টবাদ প্রচার করতে শুরু করেছিলেন; তাঁর সমর্থকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছিল।

www.banglainternet.com

Goto List

মসলার ব্যবসার কেন্দ্রও ক্রমে ক্রমে ক্যাথলিক পর্তুগাল থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট হল্যান্ডের দিকে সরে গিয়েছিল। ওলন্দাজ বণিকরা দেখল পর্তুগিজরা মসলার ব্যবসায় বেপরোয়া রকম মুনাফা করছে। তাই ১৫৯২ সালে তারা ঠিক করল ভারতের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য করার জন্য একটা কোম্পানি গঠন করবে। ১৫৯৫ সালে ওলন্দাজদের প্রথম বহর মসলার খোঁজে ইন্দোনেশিয়া গিয়ে হাজির হল। তারা এই এলাকায় মসলার বাণিজ্যে পর্তুগিজদের নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিল। ১৬০২ সালে ওলন্দাজদের ইউনাইটেড ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পূর্বদেশে ব্যবসার জন্য সরকারের কাছ থেকে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। তার বলে তারা ১৬০৪ সালে কালিকট রাজ্যের সম্রাট জামোরিন-এর সঙ্গে একটা সন্ধি করল; আসল উদ্দেশ্য এই এলাকা থেকে পর্তুগিজদের তাড়ানো।

বাণিজ্য থেকে উপনিবেশ

ওলন্দাজরা দেখল ইন্দোনেশিয়ায় পর্তুগিজদের অবস্থা কিছুটা দুর্বল। ১৬০৫ সালে তারা পর্তুগিজদের কাছ থেকে আম্বন দ্বীপ দখল করে নিল। এরপর ১৬১৯ সালে জাকার্তা দখল করল। তখন পর্তুগিজদের ইন্দোনেশিয়া থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে হটে আসতে হল। পর্তুগিজরা সিংহলের কলম্বো বন্দরে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল; ১৬৫৪ সালে ওলন্দাজরা সেখান থেকে তাদের হটিয়ে দিল; তারপর ১৬৬০ সালে কোচিনও তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিল। ১৬৬৫ সালে পর্তুগিজরা ইংল্যান্ডের সম্রাটকে বোম্বাই বন্দর উপহার দেয়; কাজেই এরপর তাদের হাতে রইল শুধু গোয়া, দামন আর দিউ।

এদিকে ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজদের সাম্রাজ্য সৃষ্টি এগিয়ে চলেছে। পর্তুগিজদের মতো তারাও স্থানীয় বাসিন্দাদের ওপর নির্মম নির্যাতন আর শোষণ চালাতে লাগল। এদেশে ইংরেজরা যেমন নীল চাষ করার জন্য কৃষকদের দাদন দিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করেছিল ঠিক সেই একই পদ্ধতি গ্রহণ করল ওলন্দাজরা। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে সেখানে নিজেরা মসলার চাষ আরম্ভ করল; সেখানে ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করতে হত স্থানীয় লোকদেরই। তারপর হুকুম জারি করল স্থানীয়রা তাদের বাগানে আর লবঙ্গ চাষ করতে পারবে না। এসব জুলুমের বিরুদ্ধে ক্রমে ক্রমে স্থানীয় লোকেরা ক্ষেপে উঠল; অস্ত্রের জোরে তাদের দমন করা হতে লাগল। যে সব বাগিচায় একদিন প্রচুর লবঙ্গ জন্মাত সেগুলোকে এখন ধান আর সাগুর জমিতে পরিণত করা হল। ওলন্দাজদের অত্যাচার আর অব্যবস্থায় এই দ্বীপগুলোর অর্থনীতি একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। মসলার ব্যবসার মুনাফাও কমে যেতে আরম্ভ করল।

ইউরোপের বাজারে ১৬৬০ সালে কফির চল হল। তার ফলে মসলার দাম পড়ে গেল, কফির ব্যবসায় মুনাফা বেশি হতে লাগল। ওলন্দাজরা দেখল লবঙ্গের চেয়ে কফি চাষে লাভ বেশি। তাই আঠার শতকের শুরুতে তারা ভারতের মালাবার থেকে কফির চারা এনে তার

www.banglainternet.com

Goto List

চাষ শুরু করল। জাভা দ্বীপে কফিই এখন প্রধান ফসল হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সে সব কফি বাগানের মালিক হল ওলন্দাজরা আর সেখানে স্থানীয় লোকদের খাটানো হত ক্রীতদাস হিসেবে।

এদিকে ইংরেজরা দেখল ওলন্দাজরা মসলার ব্যবসায় লাগামছাড়া মুনাফা করছে। ওলন্দাজদের ইউনাইটেড ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সৃষ্টির এক বছর আগেই ইংরেজদের ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রাচ্যে একচেটিয়া ব্যবসা করার জন্য রানী এলিজাবেথের কাছ থেকে সনদ নিয়েছিল। ওলন্দাজদের মুনাফায় ভাগ বসাবার জন্য ১৬০১ সালে তারা ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে হাজির হল। কিছুদিন পর ১৬১২ সালে তারা ভারতের সুরাটেও একটি বাণিজ্য ঘাঁটি করল। তারা দেখল ভারত থেকে বস্ত্র নিয়ে বিক্রি করে তার বদলে মসলা কিনলে লাভ বেশি হয়। অবশ্য ওলন্দাজদের চাপে ইংরেজরা বেশিদিন ইন্দোনেশিয়ায় টিকে থাকতে পারে নি। তার ফলে তারা ভারতের দিকেই বেশি মনোযোগ দেয় অর্থাৎ উপনিবেশ তৈরির ব্যাপারে ওলন্দাজ আর ইংরেজরা ইন্দোনেশিয়া আর ভারতকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল। এই উপনিবেশের জোয়াল থেকে বেরিয়ে স্বাধীন হতে এই দুটো দেশের বহু বছর লেগে গিয়েছিল।

এদিকে পর্তুগিজ নাবিক ম্যাজেল্লান স্পেনের পক্ষ হয়ে সমুদ্রপথে ভূপ্রদক্ষিণ করতে গিয়ে মসলাদ্বীপ আবিষ্কার করেছেন; তাই স্পেন ভাবল তার পক্ষে এই এলাকার দখলে ভাগ না বসানো হচ্ছে বোকামি। ১৫২২ সালে স্পেন এগিয়ে গেল ইন্দোনেশিয়ার দিকে। কিন্তু ওলন্দাজরা আগে থেকেই এখানে জেঁকে বসে আছে; তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্পেনকে ১৫২৯ সালে এই এলাকা থেকে সরে যেতে হল। মসলার বাণিজ্যে ওলন্দাজদের একচ্ছত্র আধিপত্য পাকাপোক্ত হল।

আঠার শতকে মসিয়েঁ পিয়ের পোয়াভ্রে (Poivre, একটু অদ্ভুত শোনালেও, নামটার বাংলা করলে হবে 'মরিচ মহাশয়') নামে এক ফরাসি বণিক এলাচ আর জায়ফলের চারা নিয়ে গেলেন ফ্রান্সে; সেখান থেকে সে সব গেল ভারত মহাসাগরের তীরে মরিশাস প্রভৃতি ফরাসি উপনিবেশে। তার ফলে আজ আর শুধু ইন্দোনেশিয়া নয়, মরিশাস, জাঞ্জিবার, মাদাগাস্কার এসব দেশেও প্রচুর মসলা জন্মায়। এসব মসলা সারা পৃথিবীতে রান্নাবান্নায়, সুগন্ধী, ওষুধ, দন্ত চিকিৎসার উপকরণ এমনি নানাভাবে ব্যবহার করা হয়।

নানা দেশে নানা ফসল

এই যে দুনিয়া জোড়া এত বিচিত্র জাতের উদ্ভিদ, তাদের মধ্যে এমন পার্থক্য কেমন করে হল, কেমন করে এসব গাছপালা গেল দেশ থেকে দেশান্তরে—সে সব কথা নিয়ে বিজ্ঞানীরা ভাবছেন বহুকাল থেকে। তাঁরা চালিয়েছেন আরেক ধরনের অভিযান। দেশ জয়ের নয়, উদ্ভিদের উৎপত্তিস্থল জানার অভিযান।

আগস্তু দ্য কাঁদোল (Augustin de Candolle, ১৭৭৮-১৮৪১) নামে এক সুইস বিজ্ঞানী বলেছিলেন, আসলে আমরা আজ যে নানা জাতের উদ্ভিদের চাষ করি তার সবই এসেছে

www.banglainternet.com

Goto List

কৃষিবিজ্ঞানী নিকোলাই ভ্যাভিলভ (১৯২৭ সালে ইথিওপিয়ায় বৈজ্ঞানিক অভিযানের পর তোলা ছবি।

www.banglainternet.com

Goto List

কাছাকাছি কোনো বুনো জাতের উদ্ভিদ থেকে। সে সময়ে কাঁসোল পরীক্ষা করেছিলেন চাষ করা ২৪৭ রকমের ফসল নিয়ে। তার মধ্যে দেখা গেল খুব কাছাকাছি বুনো জাত আছে ১৯৪টি প্রজাতির, ২৭টির রয়েছে প্রায় কাছাকাছি বুনো জাত; বাকি ২৬টি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় নি।

এসব সমস্যা নিয়ে বড় ধরনের গবেষণা শুরু করলেন সাবেক সোভিয়েত দেশের কৃষিবিজ্ঞানী অ্যাকাডেমিসিয়ান নিকোলাই ভ্যাভিলভ (Nikolai Vavilov, ১৮৮৭-১৯৪৩)। ভ্যাভিলভ দেখলেন এক গমের গণের মধ্যেই রয়েছে আটটি প্রজাতি। কিন্তু তাদের মধ্যে গুণাগুণের এমন ফারাক যে, সেগুলোর যে একই জায়গায় উৎপত্তি হয়েছে তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। এ ধরনের নানা প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্য তাঁকে বার বার বেরোতে হয়েছে অভিযানে। তিনি ১৯১৬ সালে এক বৈজ্ঞানিক তথ্য সন্ধানে গেলেন ইরানে। কাছাকাছি তাইগ্রিস আর ইউফ্রেতিস নদীর উপত্যকায় এক অতি প্রাচীন কৃষি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। ইরানে তিনি কতকগুলো সম্পূর্ণ নতুন জাতের গম, যব আর শণগাছের হদিস পেলেন।

১৯২৪ সালে ভ্যাভিলভ গেলেন আফগানিস্তানে। সেখানে দেখলেন এক ধরনের বুনো যব; এ থেকেই কি এসেছে আজকের চাষ করা যব? কিন্তু এ যবের ডাঁটা বড় বেশি ভঙ্গুর। এর বীজ মাড়াইয়ের পর তার গায়ে লেগে থাকে অতি খসখসে রোম। এ ধরনের যব সেকালের মানুষেরা হয়তো চাষ করতে উৎসাহ বোধ করত না। তার আগে ১৯২১ সালে ভ্যাভিলভ গিয়েছিলেন আমেরিকায় এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিতে। সেখানে তিনি দেখেছিলেন সে দেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা সারা দুনিয়া থেকে নানা রকম ফসলের বীজ এনে তা কৃষকদের কাছে আর বীজবিশেষজ্ঞদের কাছে পরীক্ষার জন্য বিলি করছে।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষে ১৯২৬ সালে ভ্যাভিলভ তাঁর বিখ্যাত বই *The Centres of Origin of Cultivated Plants* (চাষের ফসলের উৎসকেন্দ্রসমূহ) প্রকাশ করলেন। এ বইতে তিনি বললেন, প্রতিটি ফসলের উৎপত্তি খুঁজতে হবে এমন জায়গায় যেখানে সে ফসলের বুনো এবং চাষ করা জাতের সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্য রয়েছে। এসব জায়গাতেই মানুষ কৃষির প্রথম অবস্থায় তার চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী জাতটি খুঁজে পেয়েছিল। এছাড়া তাঁর আরেকটি সিদ্ধান্ত হল কৃষির উৎপত্তি হয়েছে মূলত পাহাড়ি এলাকায়। কেননা সমতল জায়গায় চাষ করতে হলে দরকার হত খাল আর বাঁধ যা আদিম মানুষের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব ছিল না। পাহাড়ি জমিতে ঝরনার পানি আপনা আপনি পৌঁছয়। তাছাড়া এসব পাহাড়ি এলাকায় বুনো জাত, চষা জাত আর আগাছার মধ্যে জিন বিনিময় সহজ হয়েছে। তাতে প্রতিটি প্রজাতির প্রকরণবৈচিত্র্য সহজেই ঘটেছে।

ভ্যাভিলভ বললেন, মানুষ যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে গিয়েছে তখন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে তার দরকারী ফসলের বীজগুলোকে। সে সব বীজ কিছু হয়তো নতুন জায়গার প্রতিকূল পরিবেশে টিকতে পারে নি; আবার কিছু টিকে গিয়েছে। এভাবেই নানা

www.banglainternet.com

Goto List

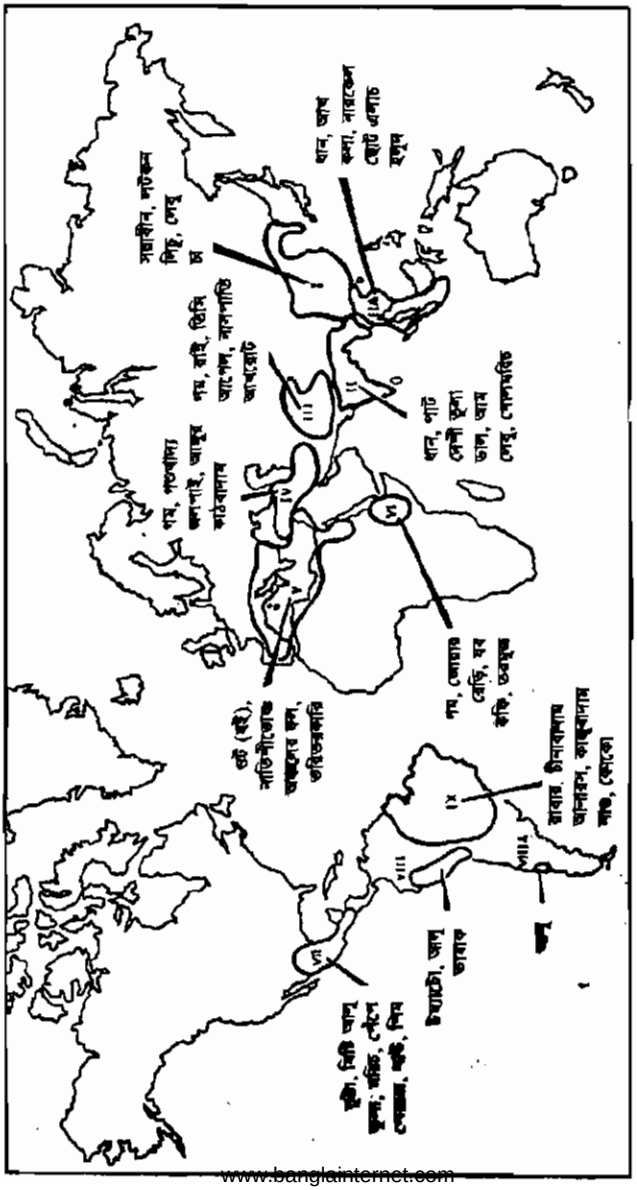

মধ্যপ্রাচ্যের উৎসকেন্দ্রসমূহের মানচিত্র (ভ্যাভিলভের অনুসরণে)

www.banglainternet.com

Goto List

ধরনের ফসল ছড়িয়েছে দেশ-দেশান্তরে। তবে মূল কেন্দ্র থেকে মানুষ যত দূরে সরে গিয়েছে প্রজাতির গুণাগুণের তত অবনতি ঘটেছে।

নানা ফসলের জন্মস্থান

ভ্যাভিলভ তাঁর বইতে প্রথমে ফসলের পাঁচটি মূল উৎসকেন্দ্র নির্দেশ করেছিলেন। ১৯২৯ সালে এক সম্মেলনে তিনি একে বাড়িয়ে ছ'টি কেন্দ্রের কথা বললেন। তারপর ১৯৪০ সালে তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর শেষ বই; তাতে তিনি বললেন সাতটি কেন্দ্রের কথা। এই কেন্দ্রগুলো হল: ১. দক্ষিণ-এশীয় কেন্দ্র; ২. পূর্ব-এশীয় কেন্দ্র; ৩. দক্ষিণ-পশ্চিম এশীয় কেন্দ্র; ৪. ভূমধ্যসাগরীয় কেন্দ্র; ৫. আবিসিনীয় (ইথিওপীয়) কেন্দ্র; ৬. মধ্য-আমেরিকা কেন্দ্র; আর ৭. আন্দীয় (আন্দিজ পর্বতাঞ্চল) কেন্দ্র।

ভ্যাভিলভ অবশ্য স্বীকার করলেন তাঁর এই হিসেবের কিছু ব্যতিক্রমও আছে। কোন কোন ফসলকে মানুষ চাষের উপযোগী করে তুলেছে এই সাতটি উৎসকেন্দ্রের বাইরে। যেমন খেজুরের চাষ শুরু হয়েছে আরবের মরূদ্যানে বা দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায়, সম্ভবত সাহারাতেও; তরমুজের চাষ শুরু হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় আর কালাহারি মরুভূমির ধারে কাছে; উনিশ শতকে আনারস, চীনাবাদাম আর রাবারের চাষ শুরু হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে। কিছু কিছু ফসল যেমন শণ, জোয়ার, আপেল, নাসপাতি পূর্ব গোলার্ধের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে চাষ শুরু হয়েছে, কাজেই তাদের উৎপত্তি কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রে ফেলা যায় না। তবে ভ্যাভিলভের নির্দেশিত কেন্দ্রের বাইরে উৎপত্তি হয়েছে এ রকম উদ্ভিদের সংখ্যা মোট ফসল সংখ্যার তিন শতাংশের বেশি নয়।

ভ্যাভিলভের পর গত পাঁচ দশকে অন্যান্য বিজ্ঞানী তাঁর উৎসকেন্দ্রের ধারণাকে আরো স্পষ্ট আর স্বচ্ছ করে তুলেছেন। তাঁরা এখন সাধারণভাবে ন'টি উৎসকেন্দ্রের হিসেব ধরেন। সেগুলোর অবস্থান এবং বিভিন্ন উৎসকেন্দ্রে যেসব ফসলের উদ্ভব হয়েছে তা একটি মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল। এসব উৎসকেন্দ্রের ধারণা থেকে আমাদের দেশের বিভিন্ন ফসলের উৎপত্তি কোথায় হয়েছে সে সম্বন্ধেও আজ অনেক কথা জানা যাচ্ছে। যেমন বাংলাদেশ আর দক্ষিণ ভারতসহ যে দক্ষিণ-এশীয় উৎসকেন্দ্র তা ধান, পাট, দেশী তুলা, নানারকম ডাল, আম, লেবু, গোলমরিচ প্রভৃতি ফসলের জন্মস্থান। এসব এখান থেকে ছড়িয়েছে আরো নানা দেশে।

আমাদের কাছাকাছি আরেক উৎসকেন্দ্র হল থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া ইত্যাদি মিলিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া; এখানে উৎপত্তি হয়েছে ধান, আখ, কলা, নারকেল, ছোট এলাচ, হলুদ এসব ফসলের। উত্তর ভারত, আফগানিস্তান, ইরান মিলে রয়েছে একটি কেন্দ্র; সেখানে উৎপত্তি হয়েছে গম, রাই, তিসি, আপেল, নাসপাতি, আখরোট এসবের। মধ্যপ্রাচ্যের উৎসকেন্দ্রে জন্মেছে গম, জলপাই, আঙুর, কাঠবাদাম এসব। চীনা উৎসকেন্দ্রে জন্ম হয়েছে সয়াবীন, লটকন, লিচু, চা আর লেবুজাতীয় ফলের। ভূমধ্যসাগরের উপকূলের দেশগুলো মিলে আছে যে উৎসকেন্দ্র তাতে জন্মেছে ওট (যই), নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফল আর তরিতরকারি,

www.banglainternet.com

Goto List

যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদি। ইথিওপিয়া হল গম, জোয়ার, রেড়ি, যব, কফি, তরমুজ এসব ফসলের উৎসস্থল।

পশ্চিম গোলার্ধে রয়েছে গোটা চারেক উৎসকেন্দ্র। তাদের মধ্যে একটি রয়েছে মেক্সিকো আর মধ্যআমেরিকায়: এখানে জন্মেছে ভুট্টা, মিষ্টি আলু, তুলা, মরিচ, পেঁপে, পেয়ারা, লাউ আর শিম। দ্বিতীয়টি রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু আর বলিভিয়ায়: এখানে উৎপত্তি টম্যাটো, আলু আর তামাকের। আরেক কেন্দ্র আছে আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিল মিলিয়ে: এখানে জন্মেছে রাবার, চীনাবাদাম, আনারস, কাজুবাদাম, সাগু আর কোকো।

এসব ফসলের উৎপত্তিতে মানুষের কি কোন হাত ছিল?—বিজ্ঞানীরা মনে করেন যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। বুনো জাতের উদ্ভিদকে বেছে নিয়ে তাকে যত্ন করে চাষ করা, পরিচর্যা করা, তারপর দিনে দিনে বহু হাজার বছর ধরে তার মধ্যে বাঞ্ছিত গুণাগুণগুলোকে উজ্জীবিত করে তোলা—এ কেবল মানুষের সৃষ্টিশীল হাত, মেধা আর শ্রমের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।

www.banglainternet.com

Goto List

পরিবেশের সংকট ও শিক্ষা ব্যবস্থা

নিজের আর চারপাশের দশজনের উন্নতি কে না চায়? আমরা সবাই চাই আমাদের চারপাশের পরিবেশ আর প্রকৃতি আরো উন্নত হোক। আমাদের জীবন আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। আমরা এ প্রজন্মের মানুষেরা যে ধরনের জীবন কাটিয়েছি আগামী দিনে আমাদের বংশধররা তার চেয়ে আরো সুন্দর পরিবেশ, সুখ-শান্তিতে ভরা আরো মনোরম জীবন পাক।

কিন্তু শুধু চাইলেই তো আর এ পৃথিবীতে সব কিছু পাওয়া যায় না। তার জন্য চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হয়। আদতে এদেশের মানুষ আমরা দুনিয়ার অনেক দেশের চেয়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছি। দুনিয়ার অনেক দেশে কৃষি আর শিল্পের উৎপাদন বেড়েছে, জীবনে নানা ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে—ঘরবাড়ি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যাতায়াতের ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। সবটা মিলিয়ে আমরা বলি তাদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে।

আমরাও আমাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে চাই। কিন্তু সেজন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পথ কোন্‌টা তা বেছে নেওয়া তেমন সহজ নয়। আমাদের চারপাশের প্রকৃতি, পরিবেশ আর সমাজকে বদলাতে হবে—এ বিষয়ে তেমন দ্বিমত দেখা যায় না। কিন্তু বদলাবার পথটা যে ঠিক কি হবে তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর সমস্যা।

পরিবর্তনের হাওয়া বইছে

এই পৃথিবীর জন্মের পর থেকেই এর গায়ে নানা পরিবর্তন ঘটে চলেছে। মানুষও তাতে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে তার নিজের আরাম-আয়েসের প্রয়োজনে। এই বিশ শতকে এসে এমনি রদবদলের ধারা পেয়েছে নতুন বেগ। আগে যেসব পরিবর্তন ঘটত বহু যুগ ধরে, আজ তেমনি পরিবর্তন ঘটছে অতি অল্প সময়ে। তার ফলে কোথাও কোথাও এসব পরিবর্তন যেন হয়ে উঠছে লাগাম-ছাড়া। পরিবর্তনের ধারা চলে যেতে চাইছে মানুষের নাগালের বাইরে।

www.banglainternet.com

Goto List

শুধু এই বিশ শতকের মধ্যে পৃথিবীতে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তার কিছু নমুনা দেখলেই বোঝা যাবে আজ এই পরিবর্তনের হার কেমন বেড়ে উঠেছে:

- জনসংখ্যা খুব দ্রুত হারে বাড়ছে; ১৯০০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ১৭০ কোটির মতো, ১৯৯৫ সালে তা তিন গুণের বেশি বেড়ে ৫৭০ কোটি ছাড়িয়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশে লোকসংখ্যা বেড়েছে ছ' গুণের ওপর—দু'কোটি থেকে হয়েছে বারো কোটি। আগামী দু'দশকে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়বে ১৭০ কোটি; অথচ এই শতাব্দীর শুরুতে সারা পৃথিবীতে বাস করত এতজন মানুষ ।
- গত এক শ' বছরে মানুষের গড়পড়তা আয়ু প্রায় দেড় গুণ হয়েছে— ৪৬ বছর থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৬ বছর। বাংলাদেশে মানুষের আয়ুর মান কিছুটা কম হলেও বৃদ্ধির হার প্রায় এ রকমই।
- সারা পৃথিবীতে শহরবাসী লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ। বাংলাদেশেও নগরায়ণ খুব দ্রুত হারে বাড়ছে।
- দুনিয়া জুড়ে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে; দু'শ বছর আগে অর্থাৎ ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের শুরুতে এই হার ছিল প্রতি লক্ষ ভাগে মোটামুটি ২৮০ ভাগ, ১৯৭২ সালে হয় প্রতি লক্ষে ৩২৭ ভাগ, ১৯৯৫ সালে এখন ৩৬০ ভাগের ওপরে। তার ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে উঠছে।
- গত এক শ' বছরে পৃথিবীতে নানা রকম জীবাশ্ম জ্বালানির (যেমন তেল, কয়লা, গ্যাস) ব্যবহার বেড়েছে প্রায় পনেরো গুণ। তাতে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ বাড়ছে; অন্যদিকে পৃথিবীতে খনিজ জ্বালানির ভাণ্ডার দ্রুত শেষ হয়ে আসছে।
- পৃথিবীর নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের পরিমাণ প্রতি বছর কমছে প্রায় এক শতাংশ হারে (বাংলাদেশে বার্ষিক কমার হার প্রায় দু'শতাংশ)। এভাবে চললে শীগ্‌গিরই পৃথিবীর বনাঞ্চল একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে।
- পৃথিবীতে প্রায় এক কোটি প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে (তাদের মধ্যে ১৫ লক্ষের মতো এ যাবৎ তালিকাবদ্ধ হয়েছে)। এর মধ্যে গত মাত্র দু'দশকে প্রায় দশ লক্ষ প্রজাতি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে; সত্তরের দশকে প্রতি বছর প্রজাতি ধ্বংসের হার ছিল মোটামুটি ৩০,০০০; দু'দশক পর আজ দাঁড়িয়েছে বছরে ৫০,০০০-এর ওপরে।

এসব পরিবর্তনের ফলে দেশে দেশে অনেক মানুষের জীবনের মান উঁচু হয়েছে, তাদের জীবনে সুখ-শান্তিও বেড়েছে। কিন্তু শুধু এটুকু হলে ছিল ভাল। দুর্ভাগ্যক্রমে একদিকে যেমন অনেক মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি বেড়েছে, তেমনি আবার সারা পৃথিবীর ওপর নেমে এসেছে এক মহাবিপদের ঘোর কালো ছায়া। পৃথিবীর পরিবেশের সামনে সৃষ্টি হয়েছে এক বিরাট বিপর্যয়ের হুমকি।

www.banglainternet.com

Goto List

সংকটের চেহারা

সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের সংখ্যা বাড়ার ফলে বনের পরিমাণ কমছে; ফুরিয়ে আসছে তেল-কয়লা এসব জীবাশ্ম জ্বালানির সঞ্চয়, পৃথিবীর খনিজ সম্পদের পুঁজি। খনিজ জ্বালানিতে যেসব কলকারখানা চলে সেগুলো দিন-রাত ধোঁয়া আর নানারকম বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশের হাওয়ায়। তার অনেকটাই আবার ক্রমে ক্রমে মাটিতে এসে পড়ছে ভুসা আর অম্লবৃষ্টি হয়ে; তার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে ধোঁয়াশা, নষ্ট হচ্ছে বন-জঙ্গল, ধ্বংস হচ্ছে পুকুর-হ্রদ-নদীর জীবজন্তু। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাড়ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা। শিল্পকারখানা যত বাড়ছে সেই সঙ্গে তত বাড়ছে পরিবেশের দূষণ।

জমি থেকে বেশি বেশি ফসল পাবার তাগিদে ক্রমেই রাসায়নিক সার আর কীটনাশকের ব্যবহার বাড়ছে। তাতে একদিকে নষ্ট হচ্ছে জমির গুণাগুণ, অন্যদিকে সেসবের অনেকটাই দূষণ ঘটাচ্ছে নানারকম জলাশয়ে, অনেক সময় আমাদের খাবার পানিতে। বাতাস, মাটি আর পানির এসব দূষণ বস্তু আশ্রয় নিচ্ছে গাছপালা, পাখি, জীবজন্তু, এমন কি মানুষের দেহে। তার ফলে নানারকম রোগের সৃষ্টি তো হচ্ছেই, অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ আর প্রাণী একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক থেকে। আবার অন্যদিকে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে যত বাড়ছে তত বাড়ছে তার তৈরি মারণাস্ত্রের ভয়াবহতা।

স্বভাবতই যে কোন মানুষের মনেই আজ প্রশ্ন দেখা দেয়: এসবের হাত থেকে কি পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, না কি সারা পৃথিবীতে মানুষের সভ্যতা তলিয়ে যাবে ধ্বংসের অতল গহ্বরে?

আমাদের বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব দেশগুলোর মধ্যে পড়ে। এমন ঘন জনবসতি বুঝি পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। প্রতিবর্গ কিলোমিটার জমিতে এখানে গড়পড়তা আট শ'র ওপর লোক বাস করে; বিশ শতক শেষ হতে হতে এই অঙ্ক হয়তো হাজারের কাছাকাছি পৌঁছবে। এদেশের জমি কি এত মানুষের খোরাক যোগাতে পারবে? কলকারখানা বাড়িয়ে এদেশের সব মানুষের জন্য কি উপযুক্ত কাজ জোটানো যাবে?

সংকটই সব নয়

কিন্তু এই সংকটটাই সব নয়। এ অবস্থার মধ্যে আমাদের কি কিছুই করবার নেই? আমরা কি একেবারেই নিয়তির হাতে সব ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকব? আসলে তো যে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি আজকের সভ্যতার চাকা ঘোরাচ্ছে, পৃথিবীকে বদলে দেবার ধারায় এমন বেগ এনে দিয়েছে তার মধ্যেই রয়েছে এই বিপদ থেকে ত্রাণেরও চাবিকাঠি। সেই চাবিকাঠি আমরা কি করে আয়ত্ত করতে পারি সে কথাই আমাদের ভাবতে হবে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, একুশ শতকে পৃথিবীতে আরো অনেক বিরাট পরিবর্তন আসছে। রোগ-ব্যাধি জয়ের ক্ষেত্রে মানুষ আরো অনেক এগিয়ে যাবে। মানুষের গড় আয়ু আজকের ৬৬

www.banglainternet.com

Goto List

বছর থেকে বেড়ে ৮০ বছর ছাড়িয়ে যাবে। নানা আশ্চর্য গুণাগুণযুক্ত নতুন নতুন ধরনের সব বস্তু তৈরি হবে। যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে আশ্চর্য রকম সব উন্নতি ঘটবে। তেমনি বিপুল সব পরিবর্তন আসবে জীব প্রযুক্তিতে; উদ্ভিদ আর প্রাণিদেহে মানুষ এমন সব পরিবর্তন ঘটাতে পারবে যা আজ কল্পনা করাও শক্ত; কৃষিতে, অর্থনীতিতে সে সবের খুব বড় মাপের প্রভাব পড়বে। শুধু পৃথিবীর ওপরেই নয়, মহাকাশ জয়ের পথেও একুশ শতকে মানুষ আরো বহু দূর এগিয়ে যাবে।

আমাদের এটা মস্ত বড় ভাগ্য যে, আমাদের বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর বদ্বীপ অঞ্চলগুলোর একটি। এদেশের জলবায়ু এমন যে, সারা বছরই এখানে কোন না কোন ফসল ফলানো যায়। এদেশের বিস্তৃত জলা জায়গাগুলোতেও রয়েছে প্রচুর সম্পদ, নানা জাতের মাছ, চিংড়ি এবং অন্যান্য দরকারি উদ্ভিদ আর প্রাণী। বাংলাদেশের একটি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হল তার বিপুল জলা অঞ্চল। দেশের মোট আয়তনের প্রায় অর্ধেকটাই জলা অঞ্চল বলে ধরা যেতে পারে। বর্ষার সময় কোন কোন বছর দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এলাকাই জলা জায়গায় পরিণত হয়। এদেশের জলা অঞ্চলে বাস করে নানা জাতের বন্যপ্রাণী। অসংখ্য নদী, হাওর-বাওরে আছে বহু বিচিত্র প্রজাতির মাছ। বাংলাদেশে রয়েছে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ; খাল-বিলে দেখা যায় প্রায় ১৫০ জাতের জলজ পাখি; মাছ আর পাখির এত রকম জাত পশ্চিমের খুব কম দেশেই আছে।

জনসংখ্যা বেড়ে ওঠায় এদেশের নদী-খাল-বিলে মাছ ধরার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। আজকাল শুকনোর সময়ে দক্ষিণের নদীগুলোতে মিঠা পানির সরবরাহ বেশ কমে যায়: তখন নদীর খাড়িতে বঙ্গোপসাগর থেকে নোনা পানি এসে ঢোকার কারণে সুন্দরবন এলাকায় 'ম্যানগ্রোভ' বা গরানবনের পরিবেশ বদলে যাচ্ছে। সুন্দরবন অঞ্চলের গাছপালা অনেক কেটে ফেলা হচ্ছে। তাতেও মাছের পরিমাণ কমে আসছে।

বাংলাদেশের একটি প্রধান সম্পদ হল এদেশে ছোটখাট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে নানা বিচিত্র জাতের উদ্ভিদ আর প্রাণীর বাস। বাংলাদেশের আয়তন পৃথিবীর মোট স্থলভাগের মাত্র হাজার ভাগের একভাগ অথচ এদেশের মানুষের সংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মোটামুটি পঞ্চাশ ভাগের একভাগ। তেমনি এদেশে আছে অসংখ্য প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, সরীসৃপ আর উভচর। কৃষিজমি বেড়ে ওঠা, নদী ভাঙ্গন, বড় বড় নদীতে অতিরিক্ত পলিপড়া—পরিবেশে এ ধরনের অনেক পরিবর্তনের ফলে এসব উদ্ভিদ আর প্রাণীর জীবনযাত্রা আজ কঠিন হয়ে উঠছে। এর ফলে অনেক বড় আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি আর সরীসৃপ মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে; এখনই প্রতিকারের ব্যবস্থা করা না গেলে আরো অনেকগুলো হয়তো শীগ্‌গিরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

পরিবেশের অবনতির ফলে এ অঞ্চলে কিছুকাল ধরে বন্যা, সাইক্লোন এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েছে; বাংলাদেশের ওপর তার বড় রকম প্রভাব পড়ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে,

www.banglainternet.com

Goto List

অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন ঘন ঘন বন্যা, আরো বেশি ভূমিক্ষয়, অস্বাভাবিক খরা, গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাওয়া এসব সমস্যা আরো সংকটজনক হয়ে দাঁড়াবে।

আমরা কী করতে পারি

পরিবেশ হল একটি দেশের বা অঞ্চলের সব মানুষের মিলিত সম্পদ, পরিবেশের সমস্যা সব মানুষের জীবনকেই ছুঁয়ে যায়; তাই পৃথিবীর সব মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে এ সংকটের মোকাবিলা করার জন্য। তার জন্য সবার আগে দরকার সব মানুষের মধ্যে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা। কিন্তু তা সম্ভব নয় যদি দেশের বেশির ভাগ মানুষ থাকে নিরক্ষর। এজন্য একটি জরুরি প্রয়োজন হল সারা দেশে সব মানুষের মধ্যে বুনিয়াদি শিক্ষার বিস্তার। অনেক সময় মানুষ না জেনে বা না বুঝে পরিবেশের ক্ষতি করে বসে। সারা পৃথিবীতে আজ প্রায় ৯৫ কোটি লোক রয়েছে নিরক্ষর,তাদের মধ্যে ৯০ শতাংশেরই বাস উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এ অবস্থার আশু পরিবর্তন না হলে অর্থাৎ পৃথিবী জুড়ে সব মানুষের মধ্যে সাক্ষরতা ও শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার না ঘটলে পৃথিবীর পরিবেশের উন্নতি ঘটানো হবে কঠিন।

বাংলাদেশে মোট বয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশ আজ লিখতে পড়তে পারে না। প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে এখনও মাত্র পাঁচজনে চারজন স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায়; কিন্তু তাদের মধ্যে আবার অর্ধেক প্রায়ই স্কুলে হাজিরা দেয় না; এদের বেশির ভাগ প্রাথমিক স্কুলের পাঠ শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। এদেশে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে; কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। দেশের অন্তত ৮০ শতাংশ ছেলেমেয়ের জন্য আট-বছর মেয়াদের বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে বয়স্ক মানুষ যারা লেখাপড়া শেখার সযোগে পান নি তাঁদের জন্যও চাই বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা। এই বুনিয়াদি শিক্ষায় ভাষা আর গণিতের সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ ও প্রযুক্তির সাক্ষরতাও সব মানুষকে দিতে হবে।

পরিবেশের সমস্যার সমাধানের জন্য একে তো রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে; আবার একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়েও অনেক কিছু করা যায়। এসব পদক্ষেপের প্রধান লক্ষ্য হবে যেন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে আর পরিবেশের ভারসাম্যকে রক্ষা করা হয়। অনেক ছোটখাট কাজের মধ্য দিয়ে এদেশের প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগতভাবে পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নিচে এধরনের কিছু পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হল:

- ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে স্বাস্থ্যনীতি রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখা: আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব, বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করব, আবর্জনা ছড়াব না।

www.banglainternet.com

Goto List

- পানি বাঁচানো, খাবার সংরক্ষণ, অপচয় এড়ানো: প্রয়োজন শেষ করে পানির কলটি বন্ধ রাখব; অপচয় এড়াবার জন্য কলের প্যাঁচ খারাপ হলে সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করে নেব; পানি, গ্যাস, বিজলি—এসব যত কম ব্যবহার করে পারা যায় তার চেষ্টা করব; খাবার জিনিস এবং অন্যান্য সম্পদের অপচয় যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলব; জীবনের সব ক্ষেত্রে বিলাসিতা বর্জন করব।
- বিভিন্ন ধরনের বস্তুর বার বার ব্যবহার: কাগজ, কাচ, প্লাস্টিক এসব যথাসম্ভব বার বার ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। পলিথিন ব্যাগ এসব 'সিনথেটিক' বস্তু যেখানে সেখানে ফেলে দিলে আপনা আপনি ক্ষয় না হয়ে পরিবেশে দূষণ ঘটায়; তার বদলে চটের থলে প্রভৃতি যেসব জিনিস বর্জ্য অবস্থায় ক্ষয় হয়ে প্রকৃতিতে মিশে যায় সেসব ব্যবহার করব।
- নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার: কাঠ, কয়লা, তেল এসব জ্বালানি পরিবেশে দূষণ ঘটায়; সে তুলনায় সূর্যের কিরণ এদেশে প্রচুর পরিমাণে মেলে, কোন রকম দূষণও সৃষ্টি করে না। কাজেই রান্নার জন্য, পানি গরম করার কাজে ইত্যাদি যেখানে যেখানে সম্ভব সৌরশক্তির ব্যবহার করলে পরিবেশের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।
- উন্নত, দূষণমুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার: ব্যক্তিগত জীবনে এবং কলকারখানায় যথাসম্ভব দূষণহীন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। নতুন ধরনের উন্নত রান্নার চুল'য় জ্বালানির ৩০ শতাংশ পোড়ে, অথচ সনাতন চুলায় পোড়ে মাত্র ১০ শতাংশ, কাজেই তাতে বেশি দূষণ সৃষ্টি হয়।
- বেশি করে গাছ লাগানো: গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, ফল-ফলারি খাবার দেয়, কাঠ দেয়, জমিতে আর বায়ুমণ্ডলে পানি আটকে রেখে আবহাওয়ার ভারসাম্য রক্ষা করে। গাছ লাগানোর কাজে ছেলেবুড়ো সবাই অংশ গ্রহণ করতে পারে। গাছ শুধু লাগালে হবে না, লাগানোর পর যেন ঠিকমতো বেড়ে ওঠে সেজন্য তার যত্নও নিতে হবে।

শিশুশিক্ষায় পরিবেশ

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আর জীবনের অভ্যাসগুলো বেশির ভাগ শৈশবেই গড়ে ওঠে। তাই পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা শিশুদের মধ্যে একেবারে শৈশবকাল থেকেই গড়ে তুলতে হবে। আমাদের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষাক্রমেও পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টি একেবারে প্রথম শ্রেণী থেকেই ঢোকানো হয়েছে। তারপর পুরো প্রাথমিক স্তরের প্রতিটি শ্রেণীতে পরিবেশের বিষয়ে কিছু কিছু শেখাবার ব্যবস্থা আছে।

একেবারে প্রাথমিক স্তরে শিশুর মধ্যে গড়ে তুলতে হবে পরিবেশের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক। শিশুদের মনে এমনিতেই পরিবেশের নানা জিনিস সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড কৌতূহল থাকে। স্বাভাবিকভাবে তারা পরিবেশের নানা জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হবে,

www.banglainternet.com

Goto List

পরিবেশের নানা বস্তু,' গাছপালা, ফুল-পাখি, জীবজন্তু, মানুষকে ভালবাসতে শিখবে। পরিবেশের নানা জিনিসকে শিশু যখন বুঝতে পারবে, কাজে লাগাতে পারবে, উন্নয়ন করতে পারবে তখন পরিবেশের প্রতি তার এই সহজাত ভালবাসা আরও গাঢ় হবে। পরিবেশের নানা বিষয়ে সে আরও বেশি করে জানতে চাইবে। শিক্ষকের আর অভিভাবকদের কাজ হবে তার এই কৌতূহলকে ক্রমাগত জাগিয়ে তোলা, নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিবেশ সম্বন্ধে তাকে আরো ভাল করে জানতে সাহায্য করা। প্রথম থেকে ওপরের শ্রেণীতে উঠতে উঠতে শিশুর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় কাছে থেকে দূরে, সহজ থেকে কিছুটা জটিল বিষয়ে ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে এগোতে থাকবে।

শিশুর প্রকৃতি পাঠ শুরু হতে পারে আমাদের কাছের গাছপালা, ফল, তরিতরকারি, ফড়িং-প্রজাপতি এসবের পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে। পর্যবেক্ষণ থেকে আসবে সেগুলোর আকার প্রকৃতি গুণাগুণ জানা, সেগুলোকে দলে ফেলা। সেখান থেকে যাওয়া যেতে পারে ঘরবাড়ি, পরিবার, রোদ-বৃষ্টি-হাওয়া, নিজেদের শরীর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এসব সম্বন্ধে জানায়। নানা জীবজন্তু কি খায়, কিভাবে খায়, কেন আর কখন খায়, গাছপালা কিভাবে বড় হয়, চাষবাস কি করে হয়, যানবাহন কিভাবে চলে—এমনি নানা বিষয় সম্বন্ধে শিশুদের জানতে ইচ্ছে করবে। আর এসব বিষয় শুধু বই থেকে না পড়িয়ে তাদের স্কুলের বাইরে নিয়ে মাঠের, বাগানের, পুকুরের, ক্ষেতের নানা জিনিস সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা সংগ্রহের সুযোগ দিতে হবে।

এভাবেই মাটি-কাদার ছোঁয়া লেগে, আলো-হাওয়ার ছোঁয়া লেগে, চারপাশের পৃথিবীকে ভালবাসতে বাসতে শিশুরা সত্যিকারভাবে প্রকৃতি আর পরিবেশকে জানতে আর বুঝতে শিখবে। তারা বুঝবে প্রকৃতি আসলে কত সুন্দর, কত বিচিত্র আর আমাদের এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য কত দরকারি, তারা এও জানবে প্রকৃতির মধ্যে একটা জিনিস আরেকটা জিনিসের সঙ্গে কী গভীর সম্পর্কে বাঁধা। আর এই জানাজানি থেকে, এই ভালবাসা থেকেই তাদের মধ্যে জন্মাবে পরিবেশকে রক্ষা করার চেতনা।

দেশের সব শিশুর মধ্যে যদি আমরা ছোটবেলা থেকে প্রকৃতির প্রতি এমনি ভালবাসা গড়ে তুলতে পারি তাহলে হয়তো একদিন আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করা তেমন কঠিন হবে না। এটা আজ স্পষ্ট যে, আমাদের সামনে পরিবেশের সংকট এক বিষম বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। থেকে থেকে খরা, বন্যা আর সাইক্লোন দেখা দিচ্ছে দেশে। কোথাও শুকিয়ে ফুটিফাটা হয়ে উঠছে মাটি; কোথাও মাটি মরে যাচ্ছে নোনায়। লাগাম ছাড়া পরিবর্তনের এলোমেলো হাওয়া বইছে দেশে; তার ফলে অনেকের জীবন হয়ে যাচ্ছে ছত্রখান, অনেক মানুষ হয়ে পড়ছে দিশেহারা।

এমনি বিপদ আজ দেখা দিয়েছে সারা পৃথিবীতেই। পৃথিবীর কিছু দেশ আজ এগিয়ে গিয়েছে; আবার অনেক দেশ তেমন এগোতে পারে নি। যারা এগিয়েছে তারা অনেক সময় শুধু নিজেদের স্বার্থ দেখেছে; পৃথিবীর পরিবেশের কথা, পৃথিবীর স্বাস্থ্যের কথা তেমন ভাবে নি। তাই সারা পৃথিবী জুড়ে আজ পরিবেশের এই বিপর্যয় দেখা দিতে আরম্ভ করেছে।

www.banglainternet.com

Goto List

কিন্তু সেজন্য তো আমাদের হাল ছেড়ে বসে থাকলে চলবে না। আমরা পিছিয়ে আছি, তাই আমাদের অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে। উন্নয়ন ছাড়া আমাদের মুক্তির কোন পথ নেই। আর এটা তো স্পষ্ট যে, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির হাত ধরে আর আগামী প্রজন্মকে সচেতন আর শিক্ষিত করে তুলেই আজকের নানা জটিল সমস্যার সমাধান আমাদের খুঁজে পেতে হবে।

সারা সৌরজগতে, সারা বিশ্বে পৃথিবী মাত্র একটিই আছে। তাই এই পৃথিবীকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। আমাদের দেশ, বাংলাদেশকে আমাদের সবাই মিলে এগিয়ে নিতে হবে।

www.banglainternet.com

Goto List

রবীন্দ্র–ভাবনায় শিক্ষা ও পরিবেশ

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের ভাবনার জগতে শিক্ষা একটি বড় জায়গা দখল করে ছিল। তাঁর নিজের শৈশবের শিক্ষাজীবন তেমন সুখকর হয় নি বলেই হয়তো তিনি শিক্ষা নিয়ে এত ভেবেছেন। ভেবে ভেবে এবং এ বিষয় নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করে তিনি যে শুধু আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের নানা নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে গভীর পরিচয় অর্জন করেছিলেন তাই নয়, শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজের বিশাল পরীক্ষাশালায় শিশু-কিশোর-তরুণদের এক নতুন জাতীয় শিক্ষাধারায় দীক্ষিত করে তোলার কর্মোদ্যোগও শুরু করেছিলেন।

শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রভাবনা তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ, চিঠি, ভ্রমণকাহিনীতে বিধৃত হয়ে আছে। দেশের শিক্ষা সমস্যার সমাধান যে কত জরুরি সে বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ পায় তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'র (১৩৩৮) এই উক্তি থেকে: "আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত-কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। ... "

এই শিক্ষার অভাব মোচন করার জন্য যে ধরনের বিশাল উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন তা সে সময়ের পরাধীন ভারতবর্ষে বাস্তব কারণেই সম্ভব ছিল না (আমাদের দেশে আজও কি সম্ভব হয়েছে?)। কিন্তু প্রাচীনপন্থী টোল-মাদ্রাসার শিক্ষা আর উগ্র ইংরেজি-ঘেঁষা শিক্ষার বিকল্প হিসেবে একটি জাতীয় শিক্ষা ধারা প্রবর্তনের যে আন্দোলন সে সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের হাত ধরে শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার এক সাহসী ও কর্মিষ্ঠ যোদ্ধা। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর অজস্র প্রবন্ধ, বক্তৃতা ইত্যাদি তার পরিচয় বহন করে।

শিক্ষা ও পরিবেশ ভাবনা

পরাধীন দেশে কেরানি তৈরির যে শিক্ষা ব্যবস্থা উনিশ শতকে গড়ে উঠেছিল তার প্রধান ঝোঁক ছিল প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি নয়, তোতাপাখির মতো মুখস্থ করে পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়ার

www.banglainternet.com

Goto List

দিকে। এই উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রবীন্দ্র ভাবনার একটি মূল দিক—প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগ স্থাপন। ছোটবেলার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা থেকেই হয়তো তাঁর মধ্যে এই প্রকৃতি প্রেমের দৃঢ় অধিষ্ঠান ঘটেছিল। কিংবা হয়তো এর উল্টোটাই সত্যি অর্থাৎ প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি গভীর অনুরাগ থেকেই তাঁর মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যান্ত্রিকতার প্রতি বিতৃষ্ণা গড়ে উঠেছিল।

প্রকৃতি ও মানুষের কাছ থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তার মূল্য পুথিগত শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি। আসলে মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব আছে তার বিকাশের জন্য প্রকৃতির উদার প্রাঙ্গণই হল সব চাইতে প্রশস্ত; তাই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন যে শিক্ষার আয়োজন তা মূলত কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারি দিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্রভাবে সুন্দরভাবে বিরাজমান। ... শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দরোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে"। (শিক্ষাসমস্যা, ১৩১৩)

এজন্যই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মেশামেশি এক আদর্শ শিক্ষাঙ্গন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথায়, "... আমি আকাশ আলোর অঙ্গশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা, পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেই সঙ্গে কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষা লাভ করবে।" আবার আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন, "মাটি জল বাতাস আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকিলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শীত গ্রীষ্মে কোন কালে আমাদের মুখ ঢাকা থাকে না, তাই আমাদের মুখের চামড়া দেহের চামড়ার চেয়ে বেশি শিক্ষিত অর্থাৎ বাহিরের সঙ্গে কী করিয়া আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাহা সে ঠিক জানে।" (শিক্ষা, ১৩১৫)

অনেক রূপক রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন শিশু মনস্তত্ত্বের গভীর তত্ত্বকথা। তাঁর 'ডাকঘর' নাটকে অমল-এর চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শিশু মনের আকুলি বিকুলি। 'তোতাকাহিনী' রচনায় প্রকাশ পেয়েছে পুথিগত শিক্ষা কিভাবে আমাদের চিত্তবৃত্তির বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয় তার ছবি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ শিশুশিক্ষার জন্য দু'খণ্ডে 'সহজ পাঠ' (১৯৩০) নামে যে বই লিখেছিলেন তারও বিষয়বস্তু প্রধানত শিশুদের চারপাশের পরিবেশ আর তাতে উপস্থাপনের ধাঁচটি ছিল মূলত মনস্তাত্ত্বিক।

বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের প্রতি ভালবাসা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিক্ষা ভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই তিনি বলতে পেরেছেন, "তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।"

www.banglainternet.com

Goto List

তাঁর সে বিশ্বসত্তা এই পৃথিবীর নানা ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে উঠে মানুষের জন্য এক মহৎ জীবনের আদর্শ তুলে ধরে। এই মহৎ জীবনের আদর্শ অর্জনের শিক্ষাকে তিনি দেখেছেন তার ব্যাপকতম অর্থে। প্রকৃত শিক্ষা কেবল মেধার বিকাশ সাধন নয়, হৃদয়ের বিকাশ সাধনও বটে। যা মানুষের সামগ্রিক সত্তার বিকাশ ঘটায় তাই হল সুশিক্ষা। আর এই সুশিক্ষার লক্ষণ হল: "তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তি দান করে।" তাঁর শিক্ষা হল এমন শিক্ষা যার প্রকৃত লক্ষ্য মানুষকে সত্যের সন্ধান দেওয়া: "আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়।" (পল্লীপ্রকৃতি) তাঁর এসব মতামতের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের সেরা শিক্ষাতত্ত্ববিদ রুশো, হোয়াইটহেড, বার্ট্রান্ড রাসেল, জন ডিউই প্রমুখের মতামতের বেশ খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এই যে মানুষকে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করা, মুক্ত মনের অধিকারী করে তোলা, সত্যসন্ধানী করা—মনে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গিই রবীন্দ্রনাথের মনে প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিজ্ঞান চর্চার প্রতি একটা গভীর আগ্রহের জন্ম দিয়েছিল। তিনি যে শুধু নিজে বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন তাই নয়, সারা দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে বিজ্ঞানের চর্চা প্রসারিত হয় সেজন্য শক্ত হাতে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো সর্বসাধারণের বোধ্য ভাষায় লেখার কাজে কলম ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান ভাবনার ক্ষেত্রে তাই নানা মাত্রা দেখতে পাওয়া যায়:

ক. শিশু-শিক্ষা বিজ্ঞানভিত্তিক হবার জন্য তাদের বইতে প্রকৃতিবিষয়ক ও বিজ্ঞাননির্ভর রচনা অন্তর্ভুক্ত করা;

খ. কাব্য গল্প-উপন্যাস ও অন্যান্য রচনায় প্রকৃতি বর্ণনা ও মানব চরিত্র বিশ্লেষণে গভীর প্রকৃতি প্রেমের প্রকাশ;

গ. তাঁর নিজের বিজ্ঞানবিষয়ক জনপ্রিয় রচনা এবং তার জন্য বিজ্ঞানের পরিভাষা নির্মাণ;

ঘ. বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে শুধু তত্ত্বগত চর্চা নয়, গ্রামীণ জীবনে তার ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনবার চেষ্টায় কৃষি ও গ্রাম উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রবর্তন;

ঙ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপপ্রয়োগ যে মানব সভ্যতার জন্য সমূহ বিপদ ডেকে আনতে পারে, এ বিষয়ে তাঁর সচেতনতা এবং নানা রচনায় তার প্রকাশ।

প্রকৃতি-জিজ্ঞাসার শুরু

রবীন্দ্রনাথের শৈশবেই তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের সূত্রপাত হয়। এ বিষয়ে তিনি 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন, "যখন আমার বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না। তখন নিভৃতে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। .." তেমনি তাঁর মনে বিজ্ঞান চেতনার সূত্রপাতও ঘটেছিল শৈশবেই তাঁর প্রকৃতিপ্রেমিক বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

www.banglainternet.com

Goto List

ঠাকুরের সাহচর্যে। ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর জন্য নর্মাল স্কুলের শিক্ষা ছাড়াও গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল; সে শিক্ষার বিস্তারও ছিল বেশ ব্যাপক। গণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার সঙ্গে চারুপাঠ আর মেঘনাদবধ কাব্য পাঠেরও আয়োজন ছিল। কুস্তি, জিমনাস্টিক্স, ড্রইং, গান শেখা আর ইংরেজিও বাদ যেত না। তাঁর বয়স যখন মাত্র ন'দশ বছর তখনই মানবদেহের অঙ্গসংস্থান ও অস্থিবিদ্যা শেখার জন্য তাকে মেডিক্যাল কলেজের শবব্যবচ্ছেদ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শৈশবে আমের আঁটি ও আতা-বীচি নিয়ে তিনি যে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন তা বৃদ্ধ বয়সে কৃষি সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে পরিণতি লাভ করে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে দুনিয়া জোড়া বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। ইউরোপে বিজ্ঞানের যে বিপুল বিকাশ আর শিল্প-বিপ্লব ঘটছিল তার ঢেউ এসে পৌঁছেছিল পরাধীন ভারতেও। উনিশ শতকের শুরুতেই স্টীম এঞ্জিনের ব্যাপক ব্যবহার যন্ত্রসভ্যতার দ্রুত বিকাশ ঘটাতে শুরু করে, মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় বিপুল আলোড়ন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের ঠিক আগে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ জীববিদ্যার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে; সেই সঙ্গে রসায়নবিদ্যার ব্যাপক বিকাশ, বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার, জীবাণুতত্ত্ব প্রভৃতি মানুষের জীবনযাত্রায় রূপান্তর ঘটাতে শুরু করেছে। মাত্র সতের বছর বয়সে ইউরোপ বাসের সময়ে তিনি বিজ্ঞানের এই অগ্রযাত্রার সঙ্গে আরো গভীর পরিচয়ের সুযোগ পান।

এই সময়ে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাও কিছুটা আরম্ভ হয়েছে। নব্য ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমেই বিজ্ঞানমুখী হয়ে উঠছে। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ লেখক-লেখিকা সহজ বাংলায় সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা লিখতে আরম্ভ করেছেন। এসব রচনা রবীন্দ্রনাথকে শৈশবকালেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

জ্যোতির্বিদ্যায় ছেলেবেলাতেই রবীন্দ্রনাথের মনে যে আকর্ষণ গড়ে ওঠে তার মূলে ছিল তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব। তাঁর যখন মাত্র বার বছর বয়স তখন হিমালয়ের ড্যালহৌসি পাহাড়ে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাবার সময় সন্ধ্যাবেলা দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, জ্যোতির্বিদ্যার নানা বিষয় বর্ণনা করতেন। তাঁর কাছে জ্যোতির্বিদ্যার বিচিত্র সব কাহিনী শুনে কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে এ বিষয়ে অনুরাগ গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কে তিনি পরে লিখেছেন, "তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম—জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।" 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' নামে তাঁর এই রচনা ১৮৭৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনকালে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১৮৮৫)। এই পত্রিকায় ছোটদের উপযোগী করে নিয়মিত জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে সুখপাঠ্য রচনা

www.banglainternet.com

Goto List

লেখার ভার পড়ে রবীন্দ্রনাথের ওপরে। সে পত্রিকার প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তিনি এসব নিয়ে লিখতেন। কিছুদিন পরে ১৮৯১ সালে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' নামে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাতেও রবীন্দ্রনাথ প্রাণিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

বিজ্ঞানের প্রতি এমন আগ্রহ ছিল বলেই পরিণত বয়সে ১৯২৬ সালে ইউরোপ সফরের সময় রবীন্দ্রনাথ জার্মানিতে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানে তাঁর কাছে তরুণ বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কে জানতে পারেন। দেশে ফিরে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ বিজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরপর ১৯৩০ সালে জার্মানিতে আরো একবার আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল।

এ সময়ে অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথম ভাগে, বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বিপুল আলোড়ন চলছে। আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রচার করে সনাতন বিজ্ঞানের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছেন। বেতারযন্ত্র, আকাশ বিজয়, তেজস্ক্রিয় পরমাণুর গড়ন, ইলেকট্রন-প্রোটন দু'ধরনের তড়িৎকণা, কোয়ান্টামবাদ, জ্যোতিষ্কলোকের রহস্য, জীবাণুতত্ত্ব, বংশগতিবিদ্যা, প্যাভলভের গ্রন্থিক্ষরণতত্ত্ব এমনি সব নানা বৈজ্ঞানিক ধারণা চারদিকে প্রচণ্ড তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। এ সবই রবীন্দ্রনাথের মনেও বিরাটভাবে দোলা দিয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সেও এসব বিষয় নিয়ে গভীর কৌতূহলবশে তিনি পড়াশোনা করেছেন প্রচুর। যেখানে বুঝতে অসুবিধা হয়েছে সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কাছে বুঝে নিতে চেষ্টা করেছেন।

সাহিত্য চর্চায় প্রভাব

বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই সহজাত অনুরাগ তাঁর সাহিত্য চর্চায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। তাঁর কাব্য, উপন্যাস, গল্প ও নাটকে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ চেতনার ছাপ সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম দিকের রচনা 'প্রভাত-সঙ্গীত (১৮৮১)-এ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রসঙ্গে তিনি বিজ্ঞানের তত্ত্বকে যেমন কাব্যরূপ দিয়েছেন, তেমনি তার অনেক পরে 'সোনার তরী'র (১৯২৩) নানা কবিতায় (বসুন্ধরা, সমুদ্রের প্রতি প্রভৃতি) ফুটে উঠেছে সমকালীন বিজ্ঞানের গতিময়তার সুর। অভিব্যক্তিবাদের ধারণা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল; তাঁর অনেক কবিতাতেই তার চিহ্ন ছড়ানো। আজকের জীবলোকের জন্ম হয়েছে আদি জীবরূপ থেকে, তখন আমাদের জীবনসত্তা হয়তো লুকানো ছিল বৃক্ষরাজির মর্মরধ্বনির রূপ নিয়ে— এই ধারণা এভাবে রূপ পেয়েছে তাঁর 'বসুন্ধরা' কবিতায়:

"মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লবনিলয়ে
আকাশের নীলিমায়।"

www.banglainternet.com

Goto List

আবার 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় তিনি সাগরের জলরাশিতে আদি প্রাণসত্তার উদ্ভবের উল্লেখ করেছেন এভাবে:

"মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজ্ঞাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। ..."

পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম আত্মীয়তার একই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে 'জন্মদিনে' কবিতায় :

"এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্কে সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্‌ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয় ... "

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে বারবার যে নিখিল চরাচরে ব্যাপ্ত বিশ্বমানবতার জয়গান গেয়েছেন, সমুদ্রের অবিরাম কলধ্বনির মধ্যে সেই একই ঐকতানের সুর তাঁর কানে বেজেছে। পৃথিবী আর সমুদ্রের সঙ্গে আত্মীয়তার এই বাণী তাঁর গদ্য রচনাতেও প্রকাশ পেয়েছে। যেমন 'ছিন্নপত্র'-তে তিনি বলছেন:

"এই পৃথিবীটা আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দু'জনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।...

শুধু যে পৃথিবী আর সমুদ্রের সঙ্গে তা নয়, বিশ্ব ভুবনের প্রতিটি কণিকার সঙ্গে তিনি বোধ করেছেন আত্মীয়তার বন্ধন। 'পত্রপুট' (১৯৩৬) কাব্যে তিনি তাই বলেছেন :

"বলি—হে সবিতা
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণু-পরমাণু।"

'নৈবেদ্য' (১৯০১) গ্রন্থের 'স্তব্ধতা' কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সেই একই বিশ্বানুভূতি :

"শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণু-পরমাণুদের নৃত্য-কলরোল
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।"

www.banglainternet.com

Goto List

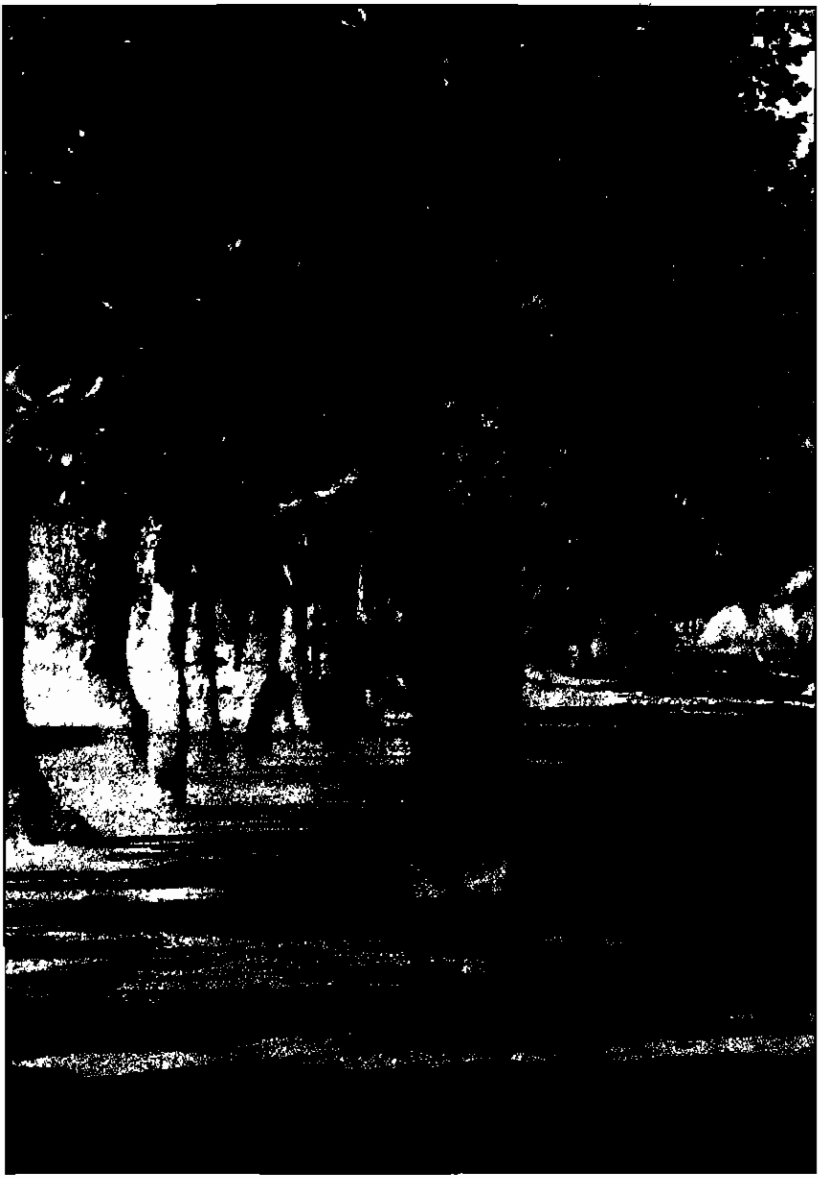

শালবীথিতে প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

www.banglainternet.com

Goto List

আগেই বলেছি, বিশ শতকের শুরুতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানুষের জীবনে এবং চিন্তার জগতে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্যে রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ দার্শনিক লেখক এই আলোড়নের ফসল। বস্তুজগতে পরমাণুর নিরন্তর গতি, অবিরাম প্রবাহ আর স্পন্দন মানুষের চিন্তার জগতেও নিয়ে এল এক প্রবল ছন্দোময়তার রেশ। তারই প্রতিফলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের 'বলাকা' (১৯১৫) প্রভৃতি কাব্যে।

যেখানে কবি নিতান্ত প্রকৃতিপ্রেমিক, সেখানেও তিনি প্রকৃতির মধ্যে দেখেন বিশ্ব সৃষ্টির নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। 'বনবাণী' গ্রন্থের 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায় (১৯২৬) তিনি উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগতের উদ্ভব আর ঐক্যের তত্ত্ব এবং এ দুয়েরই শক্তির উৎসরূপে সূর্যকিরণের ভূমিকা এক গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তুলে ধরেন আশ্চর্য কাব্যরূপ দিয়ে:

" ... জেনেছি, সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যাম স্নিগ্ধরূপ; ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎজয়ী; দিলে তারে পরম সম্মান;
হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্ধী—সে অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্ন বাধা। ... "

শুধু কাব্য চর্চার ক্ষেত্রেই নয়, রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের কাঠামোতেও অতি সহজে নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে তাঁর শেষ বয়সের রচনা 'সে' (১৯৩৭), 'তিনসঙ্গী' (১৯৪০), 'গল্পসল্প' (১৯৪১) এসব বইতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের প্রসঙ্গ নানাভাবে আকর্ষণীয় রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে। যেমন 'গল্পসল্প' বইয়ের প্রথম গল্পটির নাম 'বিজ্ঞানী'। বিজ্ঞানী নীলমণি চটি হারায় কেন তার কারণ খুঁজে পান না, অথচ চাঁদের গ্রহণ লাগায় সিকি সেকেন্ড দেরি হয় কেন তা তাঁর অঙ্কে ধরা পড়বেই। এ থেকে মনে হতে পারে এই লক্ষ্মীছাড়াকে নিয়ে তাঁর গিন্নী রেগে থাকবেন। কিন্তু না, তা নয়। কবি বলছেন, "গোপনে তোমাকে জানাচ্ছি—একেবারে তার উল্টো। ওর এই এলোমেলো আলুথালু ভাব দেখেই তিনি মুগ্ধ। আমারও সেই দশা।"

'শেষের কবিতা'র (১৯২৯) অতি আধুনিক নায়ক অমিত একদিন গঙ্গার ধারে লিরিসিক লিলি গাঙ্গুলিকে বলে: "... কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রোশী থালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয় ...।" আবার আরেক দিন সে লাবণ্যকে বলে: "...দেশে কালে পাত্রে ভেদ আছে অথচ নামে ভেদ নেই, ওটা অবৈজ্ঞানিক। Relativity of Names প্রচার করে আমি নামজাদা হব স্থির

www.banglainternet.com

Goto List

করেছি। ... সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। একঘড়ি বলে কোনো পদার্থ নেই; ট্যাকঘড়ি আছে, ট্যাক অনুসারে তার চাল। আইনস্টাইনের এই মত।" এমন বিজ্ঞানঘনিষ্ঠ সংলাপ বাংলা সাহিত্যে আর কোন্ লেখকের লেখায় পাওয়া যাবে?

লোকপ্রিয় বিজ্ঞান

পরিণত বয়সে এসেও রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ে নিবিষ্টচিত্তে পড়াশোনা করে গিয়েছেন। এরই পরিণামে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' নামে বিজ্ঞানবিষয়ক বই। সমকালীন বিজ্ঞানের প্রধান কয়েকটি দিক নিয়ে পাঁচটি প্রবন্ধের সংকলন এই বইটি—পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক ও ভূলোক; এ ছাড়া আছে উপসংহার। ১৩৪৪ সালে আলমোড়ার নিভৃত গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের সময় তিনি এটি রচনা করেন। বইটি সে বছরই আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে তিনি যে শুধু সমকালীন বিজ্ঞানের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ তুলে ধরেছেন তা নয়, সেই সঙ্গে এই বর্ণনাকে আশ্চর্য সাহিত্যরসের সুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছেন।

'বিশ্বপরিচয়' বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। উৎসর্গ উপলক্ষে কৈফিয়তের আকারে রবীন্দ্রনাথ বইটির যে ভূমিকা লিখেছেন তাতে দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান বিস্তার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার গুরুত্ব এবং বাংলায় বিজ্ঞান আলোচনার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি তাঁর মতামত সংক্ষেপে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর মনে যে একটা দর্শন সারা জীবনব্যাপী বিজ্ঞান পাঠের ও বিজ্ঞান চিন্তার ভেতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে তাও এতে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের পশ্চাৎপদতার পেছনে বিজ্ঞান চর্চার অভাব যে অনেক পরিমাণে দায়ী এই উপলব্ধি তিনি প্রকাশ করেছেন এভাবে:

> "বড়ো অরণ্যে গাছ-লায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এ দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"

'বিশ্বপরিচয়' বইতে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান আলোচনায় সহজ পরিভাষাবর্জিত রচনাভঙ্গির একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন; কিন্তু অতি সহজ করবার চেষ্টায় মালমসলা খুব বেশি কমিয়ে ভাষার তরীকে হালকা করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। কেননা, তাঁর ভাষায়, "দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না।" এ বিষয়ে তিনি এভাবে একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন:

> "যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। যে বিষয়টা শেখবার সামগ্রী,

www.banglainternet.com

Goto List

নিছক ভোগ করবার নয়, তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা করে বোঝাটাই শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর।"

রবীন্দ্রনাথ সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞান আলোচনায় ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন তা এ ধরনের: "ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে ... অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না।" এই দুই শর্ত একই সঙ্গে পালন করা যে অতি দুঃসাধ্য তাতে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের ভাষা ব্যবহারের এই মানদণ্ড তিনি নিজে ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা বজায় রেখেও সরস ও স্বচ্ছন্দ গতিময় ভাষা তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যত্র তিনি বলেছেন, "মানুষের বুদ্ধি সাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে, বিজ্ঞানে। ... জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই, তাতে ঠিক কথাটার মানে ঠিক থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়।" ('বাংলাভাষা-পরিচয়', ১৯৩৮)

প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন, এদেশে বিজ্ঞানমনস্ক চেতনার উদ্বোধন ঘটাবার আহ্বান জানিয়েছেন তা নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার আয়োজনটা তিনি বেশ পাকাপোক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন। বাগান তৈরি, বনায়ন এবং কৃষিতে তাঁর ছিল গভীর উৎসাহ। শ্রীনিকেতনে তিনি স্থাপন করেছিলেন পরীক্ষামূলক কৃষি খামার; একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কৃষিবিদ্যা শিখতে পাঠিয়েছিলেন সুদূর আমেরিকায়। এদেশের অগ্রগতিতে গ্রামের সাধারণ মানুষদের উন্নতির ভূমিকা যে কত গভীর এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ পেয়েছে ১৯৪০ সালে শ্রীনিকেতনের এক বার্ষিক উৎসবে দেয়া ভাষণে:

> "অশিক্ষিত পল্লীবাসীর সঙ্গে শিক্ষিত শহরবাসীর ভেদ দূর না করতে পারলে দেশ কখনো বড়ো হতে পারবে না। আজ বিজ্ঞানের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। সব শিক্ষার পথকে সহজ করে গ্রামে সর্বজনের সুগম করে দিতে পারাটাই সকলের চেয়ে বড়ো সেবা। যে শিক্ষা য়ুরোপ থেকে এসেছে আমাদের দেশে তাকে গ্রহণ করে, সকলের মাঝে ঢেলে দিতে হবে, কারণ শিক্ষার মধ্যে দেশ-বিদেশের ভেদ নেই।" (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৬)

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যেমন পুলকিত হয়েছেন এবং তার প্রয়োগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনকে আলোকিত করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন, তেমনি বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ এবং যন্ত্রের পীড়ন নিয়ে তিনি ছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, আতঙ্কিত। বিজ্ঞানকে শোষণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখে তিনি পীড়িত বোধ করেছেন। 'কালান্তর' (১৯১৮)-এ তিনি বলেছেন:

> "বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব মোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান দশজনের কাছে গিয়া পৌঁছায় সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু যেখানে সে

www.banglainternet.com

Goto List

> বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয়, সেখানেই তার ভয়ঙ্কর পতন। ... "

তাঁর 'রক্তকরবী' (১৯২৬) নাটকেও ধ্বনিত হয়েছে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই বই লেখার আগে তিনি সাত মাস আমেরিকায় কাটিয়েছিলেন। আমেরিকা অবস্থানের বিষয় উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন: "অনবচ্ছিন্ন সাতমাস আমেরিকার ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলাম। ... সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না।" (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি, ১৯২৫) অনেক ক্ষেত্রেই তিনি আধুনিক সভ্যতায় যন্ত্রের ব্যবহারকে দেখেছেন অভিশাপ হিসেবে। আমেরিকা থেকে ফিরে লেখা 'রক্তকরবী'তে এই যন্ত্র সভ্যতার হৃদয়হীনতার ছবিই ফুটে উঠেছে।

তা বলে কবি যে একেবারেই যন্ত্রের বিপক্ষে তা নয়। কয়েক বছর পর সোভিয়েত দেশ ঘুরে এসে তিনিই আবার লিখলেন,

> "এ কথা মানি, যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্র মন্থনের মত সে বিষও উদ্‌গার করে। পশ্চিম মহাদেশের কলতলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আসছে। ... কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তি সম্পদকে দোষ দেবো না, দোষ দেব মানুষের রিপুকে ... যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে।"

বয়সের পরিণতির সময়েও রবীন্দ্রনাথ চিন্তার ক্ষেত্রে, রচনাশৈলীর দিক থেকে নানা নতুন পথের সন্ধান করেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের শুধু 'রক্তকরবী' (১৯২৫) আর 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) দেয় নি, তাঁর সচেতন কৌতূহলদীপ্ত বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনেরও পরিচয় তুলে ধরেছে।

আজকের দিনে যখন বল্গাহীন ভোগের ফলে পৃথিবীর পরিবেশের সঙ্কট ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, মুক্তচিন্তার ধারাকে পরাস্ত করে পৃথিবীর দিকে দিকে অন্ধ বিশ্বাস আর মৌলবাদের প্রভাব মানব সভ্যতার অগ্রগতির চাকাকে পেছনের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করছে, তখন রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিঘনিষ্ঠ জীবন ধারা আর শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপ্ন, তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠতা আর মুক্ত চিন্তা একান্তই সমকালীন এবং প্রাসঙ্গিক মনে হয়। আজ থেকে প্রায় এক শ' বছর আগে দেখা রবীন্দ্রনাথের সেসব স্বপ্নকে মনে হয় তারা যেন আমাদেরও স্বপ্ন; এদেশে আগামী দিনের নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা আজও আমাদের অক্ষয় প্রেরণা।

www.banglainternet.com